দাম : দশ টাকা

১৯১৬ থেকে ২০১৬
মুসলমান তুষ্টিকরণের শতবর্ষে
কি কাটবে বাঙালির ঘুমঘোর?
— পৃঃ - ১২

স্বস্তিকা

সরস্বতী নদী কি
সত্যিই হারিয়ে
গেছে?
— পৃঃ- ১৪

৬৮ বর্ষ, ৩৫ সংখ্যা।। ১৬ মে ২০১৬।। ২ জ্যৈষ্ঠ - ১৪২৩।। যুগাব্দ ৫১১৮।। website : www.eswastika.com ।।

বৈদিক সরস্বতী নদী

বিলুপ্তির মুখ্য কারণ—

★ মহাভারতোত্তর যুগে উপনদীসমূহ থেকে বিচ্ছিন্ন সরস্বতী সরসুতি নাড়িতে পরিণত হয় এবং তার খাত প্রায় অবলুপ্ত হয়ে আসে। কারণ হিমালয় পাদদেশে বৃষ্টিপাত হ্রাস পাওয়ার দরুন জলের অপ্রাচুর্য। বর্তমান সময়ের ৩৫০০ বছর পূর্বে হিমালয়ের পাদদেশে বারিপাতের পরিমাণ এখনকার তুলনায় তিনগুণ ছিল।

★ শতদ্রু ও যমুনা প্রাচীনযুগে সরস্বতীর উপনদী ছিল। শতদ্রু ধীরে ধীরে পশ্চিমবাহিনী হয়ে শেষ পর্যন্ত সিন্ধু নদীতে মিশে গেছে। যমুনা পূর্বগামিনী হয়ে গঙ্গার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এই দুই নদীর থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াই সরস্বতী নদীর বিলুপ্তির মুখ্য কারণ।

'ইসরো' হরিয়ানার আদি বদ্রী থেকে সরস্বতীর সবচেয়ে আধুনিক খাত ধরে কচ্ছের লবণাক্ত জলাভূমি পর্যন্ত প্রথম মানচিত্র প্রকাশ করেছে।
আমেরিকার উপগ্রহ ল্যান্ডস্যাট থেকে পাওয়া ছবির সাহায্যে সরস্বতী নদীর শুকিয়ে যাওয়া ভূ-পৃষ্ঠের খাতগুলির বিশ্বাসযোগ্য নকশা প্রস্তুত করা গেছে।
সেন্ট্রাল গ্রাউন্ড ওয়াটার কমিশনের নমুনা জলের আইসোটোপ পরীক্ষা করে ভাবা অ্যাটোমিক রিসার্চ রায় দিয়েছে— এই জল এসেছে হিমালয়ের গ্লেসিয়ার থেকে।

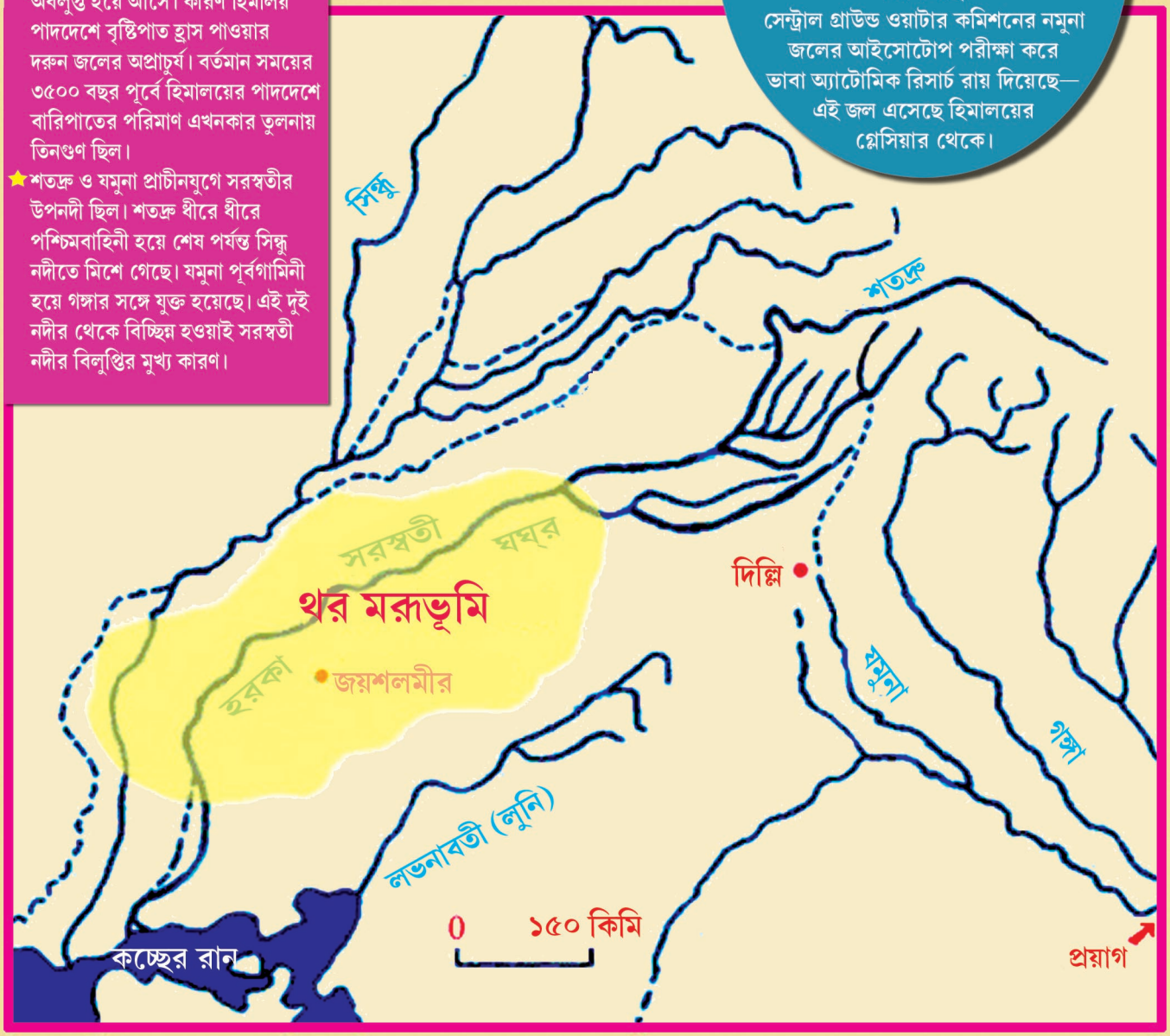

স্বস্তিকা

।। কলকাতা ও আগরতলা থেকে একযোগে প্রকাশিত বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৬৮ বর্ষ ৩৫ সংখ্যা, ২ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ

১৬ মে - ২০১৬, যুগাব্দ - ৫১১৮,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য, সুকেশ মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.-

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ▯ ৬-৯

এবারের ভোটে সেরার সেরা শিরোপাটি সাংবাদিকদের প্রাপ্য ▯ গূঢ়পুরুষ ▯ ১০

খোলা চিঠি : বাংলার ভাগ্যাকাশে দুর্যোগের ঘনঘটা ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ১১

১৯১৬ থেকে ২০১৬ মুসলমান তুষ্টিকরণের শতবর্ষে কি কাটবে বাঙালির ঘুমঘোর? ▯ অমলকান্তি বসু ▯ ১২

সরস্বতী নদী কি সত্যিই হারিয়ে গেছে? ▯ দেবীপ্রসাদ রায় ▯ ১৪

বৈদিক সরস্বতী নদী অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত ▯ স্বপন দাশগুপ্ত ▯ ১৭

বুদ্ধের জাতকের কাহিনিই 'ঈশফস্ ফেবল্স্' নামে ছড়িয়ে ছিল বিশ্বে ▯ ড. তুষারকান্তি ঘোষ ▯ ২১

এনডিএ-কে দেশের যুব সমাজের জন্য চাকরি তৈরি করতেই হবে ▯ রাজীব কুমার ▯ ২৭

ভাগ্যিস কানহাইয়া ছিল! সত্যিগুলো একে একে সামনে আসছে ▯ দিব্যজ্যোতি চৌধুরী ▯ ২৯

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা অগণিত কানহাইয়া কুমারের জন্ম দিয়েছে ▯ ড. ইন্দ্রজিৎ সরকার ▯ ৩১

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ ▯ নবাঙ্কুর : ২৪-২৫ ▯ অঙ্গনা : ২৬ ▯ অন্যরকম : ৩৩ ▯ পুস্তক প্রসঙ্গ : ৩৫ ▯ সমাবেশ-সমাচার : ৩৬-৩৮▯ রঙ্গম : ৩৯ ▯ শব্দরূপ : ৪০ ▯ প্রাসঙ্গিকী : ৪২

প্রকাশিত হবে
২৩ মে, '১৬

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
২৩ মে, '১৬

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

রাসবিহারী ও বীর সাভারকর

এই মে মাসেই ভারতে জন্ম নিয়েছিলেন দুই প্রখ্যাত বিপ্লবী— রাসবিহারী বসু ও বিনায়ক দামোদর সাভারকর, দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে যাঁদের অবদান চিরস্মরণীয়। আজ যখন দেশবিরোধী শক্তি এঁদের 'সন্ত্রাসবাদী' আখ্যায় অভিহিত করতে ব্যস্ত, তখন আমরা দেশবাসীকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই স্বাধীনতা সংগ্রামের গৌরব-গাথা। লিখেছেন : প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়, অম্লানকুসুম ঘোষ প্রমুখ।

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন,
বোলপুর,
মোবাইল -
৯২৩২৪০৯০৮৫

সানরাইজ®

শাহী গরম মশলা

SUNRISE PURE

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

সম্পাদকীয়

বাক্‌স্বাধীনতার স্বরূপ

অবশেষে গত ৬ মে রাত্রিতে বাক্‌স্বাধীনতার স্বরূপ উন্মোচিত হইল। বোঝা যাইল ভারতবর্ষকে গালি দিবার অধিকারকেই 'বাকস্বাধীনতা' কহে। বোঝা যাইল এ জিনিস সহ্য করিতে পারিলেই 'সহিষ্ণু', আর প্রতিবাদ করিলেই তুমি 'অসহিষ্ণু'। প্রশ্ন হইল, পৃথিবী জুড়িয়া যে মতবাদ অবলুপ্ত প্রজাতিতে পরিণত হইয়াছে, এই বাংলা তথা ভারতেও গত বিধানসভা ও লোকসভা নির্বাচনে যাহাদের মানুষ কুলার বাতাস দিয়া বিদায় করিয়াছেন, তাহাদের অক্সিজেন জোগাইবার ভার লইল কে? একটি সংবাদগোষ্ঠী তাহাদের বৌদ্ধিক বিকাশের ভার লইয়াছেন। ইহারা 'নাগপুর'-জুজু দেখিতে যারপরনাই অভ্যস্থ। ঘটনার পরের দিন প্রভাতে তাহাদের সম্পাদকীয় স্তম্ভে স্বতঃপ্রণোদিত রেফারিং দ্বারা নাগপুরের পরাজয় ঘোষণা করা হয়েছিল। ইহাদের বোধগম্য হয় নাই জে এন ইউ চত্বরে আফজল গুরুর মৃত্যুবার্ষিকী পালনে অন্যায় কোথায়! যাহাদের প্রভাতী দৈনিকের প্রথম পৃষ্ঠা স্বাধীনতা দিবসের সকালে ধনঞ্জয় নামক এক ফাঁসি হওয়া ধর্ষকের চরণযুগল শোভিত হয়, কেবল তাহাদের পক্ষেই অর্বাচীনের ন্যায় এইকথা বলা সাজে। আফজল গুরুর মৃত্যুবার্ষিকী পালন জাতীয়তা, আন্তর্জাতিকতার প্রশ্ন নয়। যে আমাদের দেশের নির্বাচিত সাংসদদের মারিতে উদ্যত হইয়াছিল, যে ভারতবর্ষের সংবিধান মোতাবেক দোষী সাব্যস্ত হইয়া শাস্তিপ্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহার ফাঁসির আয়োজন করিয়াছিল তৎকালীন ইউপিএ সরকার। সুতরাং আফজল গুরুর মৃত্যুবার্ষিকী পালনকে যাঁহারা বিজেপি বিরোধিতা, আর এস এস বিরোধিতা বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা শুধু এই দেশের জনগণের সঙ্গেই প্রতারণা করিতেছেন না, সংবিধানের চক্ষেও ক্ষমাহীন অপরাধ করিতেছেন। সেই সংবাদমাধ্যমে যখন নাগপুরের পরাজয় ঘোষণার বাণী লিপিবদ্ধ হইতেছিল, তখনও সম্পাদক মহাশয়ের যাদবপুর কাণ্ড কর্ণগোচর হয় নাই। তাহা কর্ণে যাইতেই তিনি বুঝিলেন মিথ্যার ঢাক ফাঁসিয়াছে, শাক দিয়া আর মাছ ঢাকা যাইতেছে না। যাদবপুরের পেলবমতি বালক-বালিকারা না বুঝন, ইহাদের মদতদাতা সম্পাদক মহাশয়ের জ্ঞানের নাড়ি যথেষ্ট টনটনে, তিনি বুঝিলেন মুখোশে টান পড়িয়াছে, খুলিবার অপেক্ষা মাত্র। তাই ছাত্রছাত্রীদের মৃদু ভৎর্সনা করিয়া এই রাউন্ডে 'নাগপুর'-কে জয়ী ঘোষণা করিলেন, অবশ্যই ব্যঙ্গার্থে। ইহাদের ধৃষ্টতা এমন পর্যায়ে পৌঁছাইয়াছে যে প্রধানমন্ত্রী জনসভা করিবেন না অরিন্দম চক্রবর্তীর সভায় যাইবেন, সেই জ্ঞান পর্যন্ত দিতেছেন। মুশকিল হইতেছে, সুকুমার রায়ের আবোল তাবোল পড়িয়া লোকে হাসিয়া বাঁচিত এবং তাহাতে অনুরক্ত হইত। এখন লোকে ইহাদের আবোল তাবোল শুনিয়া বিদ্রূপ করিতেছেন। ইহারা জনগণের নিকট ঘৃণ্য হইতেছেন। জাতীয়তাবাদের ইস্যুতে ক্রিকেট খেলায় কাহাকে সমর্থন করিবেন, না করিবেন তাহা লইয়াই সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় যে ঢং ইহারা দেখাইয়াছেন তাহাতে মানুষ হাসিবেন না কাঁদিবেন ভাবিয়া কূল পান নাই। কমিউনিস্ট মুক্ত বিশ্ব গড়ার আহ্বানে বিশ্ববাসী বহুকালই সাড়া দিয়াছেন, গত লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস মুক্ত ভারত গড়ার আহ্বানেও ভারতবাসী গলা মিলাইয়াছেন। সুতরাং মোদীর স্বচ্ছ ভারত অভিযানের পূর্বেই রাজনৈতিক স্বচ্ছতা আমাদের হস্তগত হইয়াছিল। কমিউনিস্ট ও কংগ্রেস—এই দুই জীবাশ্মের ঠাঁই এদেশের কোনো যাদুঘরে হয় নাই, সংবাদমাধ্যমটি যদি স্বতঃউদ্যোগে তাহাদের জে এন ইউ, জে ইউ-এর মতো দুই-চারটি স্থানে সংরক্ষিত রাখিতে চান তাহাতে আপত্তির কিছু নাই। কিন্তু ভারতীয় জনগণের অর্থে এই দুই অপ-জীবাশ্মর সংরক্ষণের সার্থকতা কী সে প্রশ্ন উঠিবেই। আমাদের আশঙ্কা অন্যত্র। আমরা তাহাদের ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি সম্বন্ধে যেটুকু অবগত আছি তাহাতে জানি নুন না খাইলে গুণ গাওয়ার পাত্র তাঁহারা নন। প্রতি সন্ধ্যায় ফুলবাবুটি সাজিয়া তাঁহাদের অনুগত বুদ্ধিজীবী ও পোষ্য বিশেষজ্ঞকুল স্টুডিয়ো আলো করিয়া কিংবা উত্তর সম্পাদকীয়র পৃষ্ঠা জুড়িয়া যে সব দুর্বুদ্ধি জোগাইতেছেন, তাঁহারা আলুনি তরকারি খাইয়া, 'বাঁচাও বাঁচাও' পালায় অভিনয় করিতেছেন, ইহা ভাবিবার কোনো কারণ নাই। সুতরাং ইহার উৎস সন্ধান প্রয়োজন, দেশের অর্থনীতি ও বিদেশনীতির কারণেও বটে। ভাবিতে কষ্ট হয়, ইহাদের পিতা-পিতামহেরা কত যত্ন করিয়া গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভটিকে খাড়া করাইয়াছিলেন। কিন্তু এখন তাঁহারা পিতৃপুরুষের ধর্ম (রিলিজিয়ন অর্থে নহে) বিসর্জন দিয়া আধুনিক হওয়ার তাগিদে সেই স্তম্ভটিকে পুনর্নির্মাণের বাসনায় যেসব নকশালি সিন্ডিকেটের ভুসিমাল আমদানি করিয়াছেন তাহাতে দুর্ঘটনার সম্ভাবনাই প্রবল। সুতরাং ইহাকে উপড়াইয়া ফেলাই সচেতন নাগরিকের একমাত্র কর্তব্য, ভারতবর্ষের গণতন্ত্র রক্ষার স্বার্থেই।

সুভাষিতম্

বৃথা বৃষ্টিঃ সমুদ্রেষু বৃথা তৃপ্তেষু ভোজনম্।
বৃথা দানং ধনাঢ্যেষু বৃথা দীপো দিবাঽপি চ।।

সমুদ্রে বৃষ্টিপাত বৃথা, খেয়ে তৃপ্ত হওয়া ব্যক্তিকে খাওয়ানো বৃথা, ধনী ব্যক্তিকে দান করা বৃথা এবং দিবালোকে প্রদীপ জ্বালানো বৃথা হয়।

মালদার কালিয়াচক বারুদের স্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে শাসকদল প্রত্যক্ষ জড়িত

বিশেষ সংবাদদাতা।। মালদার কালিয়াচকের অনতিদূরে বৈষ্ণবনগরের জৈনপুরে বোমা বাঁধতে গিয়ে বিস্ফোরণে ৪ জন দুষ্কৃতী মারা যাওয়ার পর সেখান থেকে পাওয়া বোমাগুলি নিষ্ক্রিয় করতে গিয়ে মালদার দুই সি. আই. ডি. কর্মীর মৃত্যুকে ঘিরে তাদের পরিবার বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন পুলিশেরই বিরুদ্ধে।

বিস্ফোরণে জ্বলছে তৃণমূল নেতার ঘর।

গত ২ মে সোমবার দুপুরে আগেরদিন রাতের ঘটনাস্থল থেকে পাওয়া বোমাগুলি নিষ্ক্রিয় করতে গিয়ে যে বিস্ফোরণ ঘটে তাতে আহত হন সি আই ডি কর্মী বিশুদ্ধানন্দ মিশ্র, কনস্টেবল সুব্রত চৌধুরী ও মনিরুজ্জামান। তাঁদের জৈনপুর গ্রাম থেকে উদ্ধার করে মালদা মেডিকেল কলেজে আনা হয়। সেখানেই গুরুতর আহত তিন জন সি আই ডি কর্মীকে চিকিৎসার পর কলকাতার উদ্দেশে রওনা দেয় একটি গাড়ি। কিন্তু পথেই দুজনের মৃত্যু হয়। তাঁদের মৃত্যুর খবর পরিবারের কাছে পৌঁছতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন তাঁরা। মালদা মেডিকেল কলেজে পুলিশ আধিকারিকদের সামনেই তারা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। তারা প্রায় মারমুখী হয়ে অভিযোগ করতে থাকেন, ঘটনা ঘটার পরই কেন পরিবারের মানুষজনকে জানানো হয়নি। সংবাদ মাধ্যমের থেকে জেনে তারা হাসপাতালে ছুটে এসেছেন। কেন এই দুই সি আই ডি কর্মীকে চিকিৎসা না করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফেলে রাখা হলো। সরকারি কাজে গিয়ে আহত হলো অথচ তাদের কলকাতা নিয়ে যাওয়ার জন্য অ্যাম্বুলেন্সের টাকা কেন চাওয়া হলো? প্রশ্ন তোলা হয়, যে অ্যাম্বুলেন্সে করে আহতদের কলকাতা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, সেই অ্যাম্বুলেন্সে কেন অক্সিজেনের ব্যবস্থা করা হয়নি। অভিযোগ করা হয়েছে, অক্সিজেন সিলিন্ডার খোঁজার জন্য কেন এক ঘণ্টা দেরি করা হলো?

প্রশ্ন তোলা হয়েছে, মালদা জেলা কার্যত বোমা ও আফিমের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। তা জানার পরেও কেন উপযুক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছাড়াই সিআইডি কর্মীদের বোমা নিষ্ক্রিয় করতে পাঠানো হয়েছিল? বেসরকারি সূত্রে জানা গেছে, গত ২ মে বৈষ্ণবনগরের জৈনপুরে ৪ জন দুষ্কৃতী ছাড়াও আরও তিন জন বোমা বাঁধার সময়ে বিস্ফোরণে মারা যায় এবং তাদের দেহগুলি রাতারাতি সরিয়ে ফেলা হয়েছিল। খবরে প্রকাশ, এরা সবাই তৃণমূলের সক্রিয় কর্মী। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দেড় বছর আগে মালদার ইংলিশ বাজার থানার যদুপুর ১নং অঞ্চলের নরেন্দ্রপুর গ্রামেও তিন জন দুষ্কৃতী বোমা বাঁধতে গিয়ে মারা গেলে পুলিশ সেক্ষেত্রেও কোনো তদন্ত করেনি এবং দেহগুলি উদ্ধার করতে পারেনি। গ্রামবাসীরা প্রশ্ন তুলেছেন কেন তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা বোমা বাঁধছিল তা প্রশাসন তাদের জানাক। এককথায় মালদা জেলা বারুদের স্তূপের মধ্যে রয়েছে। জঙ্গিরা রাজনৈতিক আশ্রয়ে প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

গত ৩ মে ক্ষোভ ও চোখের জলে চিরবিদায় নিলেন বোমা বিস্ফোরণে নিহত দুই সি আই ডি কর্মী। মালদা পুলিশ লাইন মাঠে তাদের গার্ড অফ অনার দেওয়া হয়। কিন্তু বৈষ্ণবনগরের জৈনপুরে বোমা নিষ্ক্রিয় করতে গিয়ে দুই পুলিশ কর্মীর এভাবে মৃত্যু, মেনে নিতে পারছেন না তাঁদের আত্মীয় পরিজনেরা। দুই পুলিশ কর্মীর মৃত্যুর জন্য পুলিশ বিভাগের গাফিলতিকেই দায়ী করেছেন অনেকে। মৃত বিশুদ্ধানন্দ মিশ্রর বাড়ি মালদা জেলার রতুয়া থানার একবর্ণা গ্রামে। থাকতেন মালদা শহরের বাড়িতে। রয়েছেন স্ত্রী পাপিয়া মিশ্র এবং কন্যা তৃষা মিশ্র। তৃষা চিন্তামণি চমৎকার স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রী। কনস্টেবল সুব্রত চৌধুরীর বাড়ি কালিয়াচক-২ ব্লকের বাঙ্গীটোলাতে। বাড়িতে রয়েছেন অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী শম্পা চৌধুরী। আর রয়েছে দেড় বছরের পুত্র আর্য। সুব্রতবাবুর সমাজসেবায় রুচি ছিল এবং একটি ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। দুই পরিবারের পক্ষ থেকেই এই অকালমৃত্যুর জন্য সি আই ডি কর্তাদের কাছে নালিশ জানানো হয়েছে পুলিশের বিরুদ্ধে। জানা গেছে, দুই পরিবারের পক্ষ থেকেই জেলা পুলিশের বিরুদ্ধে চিকিৎসার গাফিলতির অভিযোগ জানানো হয়েছে। কিন্তু তৃণমূল শাসিত রাজ্যে পুলিশ ও সাধারণ মানুষের জীবনের মূল্য ও নিরাপত্তা নেই, কেবল নেতাদের জন্য রয়েছে কঠোর নিরাপত্তা।

স্থানীয় মানুষদের দাবি, এই ঘটনা এন আই এ-কে দিয়ে তদন্ত করানো হোক।

বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ক্ষেত্রে দৃঢ় ভারত-জাপান সম্পর্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি।। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হর্ষবর্ধন গত ৬ মে নিউ দিল্লীতে জাপানের শিক্ষা, সংস্কৃতি, ক্রীড়া, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক মন্ত্রী হিরোদেই হাসির সঙ্গে একটি বৈঠকে মিলিত হন।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে সম্মিলিত ভাবে কাজ করা নিয়ে দু'জনের মধ্যে সদর্থক আলাপ আলোচনা হয়। ছ' মাস আগে জাপানে বৈঠকের পর এবার ভারতে এসে আলোচনা সারলেন হাসি। ইতিপূর্বেই ভারত-জাপান উদ্যোগে আর্টিফিসিয়াল ইনটেলিজেন্স, শক্তি, সমুদ্র বিজ্ঞান ও নৌ-যন্ত্রপাতি, তথ্যের ব্যবহার ও বিশ্লেষণ, জৈব তথ্যের গবেষণা এবং উন্নয়ন নিয়ে বহু প্রকল্প চলছে।

ভারতের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক মন্ত্রী হর্ষবর্ধনের সঙ্গে এক বৈঠকে জাপানের বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিষয়ক মন্ত্রী হিরোদেই।

এই প্রকল্পগুলির অংশ হিসাবে শিক্ষার্থী বিনিময়, ভারতীয় গবেষকদের প্রশিক্ষণ, স্কলারশিপ ও যৌথ গবেষণা বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।

আই এস-র চৌহদ্দিতে ভারতীয় দূতাবাস

নিজস্ব প্রতিনিধি।। ইরাকের উত্তরাঞ্চলে কুর্দিশ অধ্যুষিত এরবিল শহরে দূতাবাস খোলার সিদ্ধান্ত নিল ভারত সরকার। ইরাকে এখন কুর্দিশদের সঙ্গে আই এস জঙ্গিদের ভয়ানক যুদ্ধ চলছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের এই সিদ্ধান্ত কূটনৈতিক দিক থেকে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

বিদেশমন্ত্রক সূত্রে জানা গেছে যুদ্ধ-পরবর্তী ইরাকের সম্ভাব্য পরিস্থিতি কী হতে পারে তা বিচার করেই ভারত সরকারের এই সিদ্ধান্ত। ভারত সরকার মনে করছে যুদ্ধ পরবর্তী ইরাকে কুর্দিশরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

আনুষ্ঠানিকভাবে একথা বলা হলেও আরও কিছু সুবিধার কথা উড়িয়ে দিচ্ছেন না কূটনীতি বিশেষজ্ঞরা। ২০১৪ সালের জুলাই মাসে ইরাকের মসুল শহরে আই এস জঙ্গিরা ৩৯ জন ভারতীয়কে অপহরণ করে। এরবিল হলো মসুলের সব থেকে নিকটবর্তী বড়ো শহর। তার থেকেও বড়ো কথা এরবিলে আই এস জঙ্গিদের উৎপাত নেই। সুতরাং এখানে দূতাবাস খুলে ভারত যে প্রথমেই তার নাগরিকদের জঙ্গিদের কবল থেকে উদ্ধার করতে সচেষ্ট হবে সে কথা বলাই বাহুল্য। পরের কাজটি হবে স্বাধীন কুর্দিশদের সঙ্গে গভীর কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করা। মধ্যপ্রাচ্যের অন্তঃরাষ্ট্রীয় বিদেশনীতি এবং কূটনীতির প্রেক্ষাপটে ভারতের এই অবস্থান যথেষ্ট সম্ভাবনাময় বলে জানাচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা।

বিদেশমন্ত্রকের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, ২০১৪ সালের অপহরণ কাণ্ডের পরেই কুর্দিশস্তানে দূতাবাস খোলার কথা ভাবা হয়। ইরাকে প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত সুরেশ রেড্ডি সে সময় অপহৃতদের উদ্ধার করার জন্য চেষ্টা করেছিলেন। ভারত যে কুর্দিশস্তানের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে ইচ্ছুক সুরেশ রেড্ডি সে দেশের বিদেশমন্ত্রী ফালাহ্ মুস্তাফাকে তা বোঝাতে সক্ষম হন। উল্লেখ্য, কুর্দিশস্তান ইরাকের অঙ্গরাজ্য হলেও রাজ্যটি অঞ্চলিক স্বায়ত্ত শাসনের অধিকারী। ইরাকের সংবিধানও তাদের এই অধিকারকে মান্যতা দেয়। আই এস জঙ্গিদের বিরুদ্ধে কুর্দিশরা এখন লড়ছে স্বাধীন কুর্দিশস্তানের আশায়।

ভারত সরকারের এই সিদ্ধান্ত নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েস্ট এশিয়ান স্টাডিজের অধ্যাপক অশ্বিনী মহাপাত্র বললেন, 'কোনো দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে, বিশেষ করে উপদলীয় সংঘর্ষের ক্ষেত্রে ভারত চিরকালই ধরি মাছ না ছুঁই পানি গোছের অবস্থান নিয়েছে। মোদী সরকারের এই সিদ্ধান্তের প্রয়োজন ছিল।'

বিদেশমন্ত্রকের ওই আধিকারিকের মতে এরবিল শহরে দূতাবাসের কাজ শুরু হয়ে গেলে ইরাকের যুদ্ধক্ষেত্রের খুব কাছে পৌঁছে যাবে ভারত। যুদ্ধপরবর্তী ইরাকে যা ভারতের পায়ের নীচের জমি শক্ত করতে সাহায্য করবে।

দূষিত পুঁজি তাড়ানোর ক্ষেত্রে ভারতের উল্লেখযোগ্য সফলতা

নিজস্ব প্রতিনিধি।। সম্প্রতি দ্য ইকনোমিস্ট নামের সম্ভ্রান্ত অর্থনীতি সংক্রান্ত পত্রিকায় 'crony capitalism'-এর বৃদ্ধির সূচকে ভারতের স্থান ২০০৮ সালে জিডিপি-র শতকরা ১৮ শতাংশ থেকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণভাবে মাত্র ৩ শতাংশে নেমে এসেছে। এই 'crony capitalism' কথাটি প্রায়শই রাজনৈতিকদলগুলি একে অপরের কুকর্মের নিদর্শন হিসেবেই ব্যবহার করে থাকে। অর্থনীতির পরিভাষায় এর অর্থ ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের ক্ষমতাসীন সরকার ও তার আমলাশ্রেণীর সঙ্গে গা মাখামাখি করে চলা। যার ফলে সরকার তাদের পেটোয়া পুঁজিপতিদের মনমতো পারমিট, লাইসেন্স, দরকার মতো কর ছাড় ইত্যাদি সুবিধেগুলি তাদের (পুঁজিপতিদের) মর্জিমাফিক প্রদান করে থাকে। ফুলে ফেঁপে ওঠে তাদের সম্পদ। আর এই পুঁজিপতিরা নিজেদের মধ্যে বা অনেক সময় পরিবারবদ্ধ হয়ে অর্থনীতিতে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করে। এই প্রভাবের মাত্রা অনেক সময় এমন একটা জায়গায় পৌঁছয় যখন এই সব ব্যবসায়িক গোষ্ঠী সরাসরি সরকারের ওপর প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করে এবং প্রায়শই সফল হয়। উদাহরণ দিলে দেখা যাবে আমাদের দেশে ২জি স্পেকট্রাম বিলি, কয়লাখনি লাইসেন্স ইত্যাদি 'crony capitalism'-এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। যাই হোক, সংবাদ অনুযায়ী এই ভাবে যাকে বলে সরকারের ওপর অন্যায় প্রভাব খাটিয়ে নিজেদের সম্পদ বৃদ্ধির প্রচেষ্টার ফলে ২০০৮ সালের জিডিপি-র শতকরা ১৮ শতাংশই ছিল এঁদের সম্পদ বৃদ্ধির প্রতিফলন। সর্বশেষ হিসেব অনুযায়ী সরকারের কড়া পদক্ষেপ ও সরকারি কাজকর্মে স্বচ্ছতা পুনরুদ্ধারের সফল চেষ্টার ফলে ভারতের জিডিপি-তে এই দুষ্ট চক্রের প্রভাব কমে ৩ শতাংশে নেমে এসেছে।

এটি এমন একটি সূচক যেখানে সব দেশই চায় কম নম্বর পেতে। ২০০৮ সালে ভারতের আন্তর্জাতিক সূচকে স্থান ছিল রাশিয়ার ঠিক পরেই। সেই সময় রাশিয়ায় 'crony capitalism'-এর দৌরাত্ম্য ছিল চরমে। বর্তমানে ভারতের স্থান উন্নত দেশ অস্ট্রেলিয়ার ঠিক পরেই অষ্টম স্থানে। দেশের মধ্যে পণ্যসামগ্রীর দাম কম থাকা, শেয়ার বাজারে অনাবশ্যক অনুপস্থিতি ও সর্বোপরি রিয়েলিটি ব্যবসায় এশিয়া জুড়েই চড়া বৃদ্ধির গতি থেমে যাওয়ার ফলেই অসাধু পুঁজির বৃদ্ধি অনেকটাই কমে এসেছে। এ প্রসঙ্গে নির্দিষ্ট কোনো ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের দ্বারা নিয়ন্ত্রণের বদলে প্রধানমন্ত্রীর 'অর্থনীতিকে সরাসরি তুমুল প্রতিযোগিতার মুখোমুখি করে দেওয়ার' নীতিই বড় ভূমিকা নিয়েছে বলে প্রকাশ।

এদিকে তথাকথিত খনি, শক্তি, তেলের মতো প্রবলভাবে সরকারি আইন কানুনের আওতায় থাকা শিল্পের থেকে ভোগ্যপণ্য, তথ্য প্রযুক্তি বা পরিষেবা ক্ষেত্রে শিল্পোদ্যোগ বৃদ্ধি পাওয়াও দূষিত পুঁজি বৃদ্ধিতে ভাটা পড়ার একটা বড় কারণ। প্রসঙ্গত বিশ্বের বর্তমানে পুঁজির স্বচ্ছতায় প্রথম স্থানে রয়েছে জার্মানি।

ইন্দিরা হত্যার পর নরসিমহাকে এড়িয়ে সরাসরি পিএমও-তে রিপোর্টের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি।। আগামী জুলাই মাসে প্রকাশ হতে চলেছে ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী নরসিমহা রাওয়ের দ্বিতীয় গ্রন্থ। সেই গ্রন্থে ইন্দিরা হত্যার পর নির্বাচিত রাজীব সরকারের তৎকালীন গৃহমন্ত্রী হিসেবে কী অবমাননাকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন তার চাঞ্চল্যকর বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন বলে প্রকাশ। প্রসঙ্গত রাও তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'ইনসাইডার'-এ দ্বর্থহীন ভাষায় জরুরি অবস্থার সময় ইন্দিরার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের জটিলতা, রাজীবের সঙ্গে তাঁর চাটুকারিতাহীন শীতল সম্পর্ক ও সর্বশেষ সোনিয়ার সঙ্গে তাঁর বিক্ষুব্ধ, তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা আগেই প্রকাশ করেছেন।

প্রসিদ্ধ সাংবাদিক বিনয় সিতাপতি শ্রী রাওয়ের সংরক্ষিত বিপুল ব্যক্তিগত তথ্যভাণ্ডার থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে দেখিয়েছেন ১৯৮৪ সালের ৩১ ডিসেম্বরে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর এক অতি ঘনিষ্ঠ কংগ্রেস নেতা তাঁকে ফোন করে জানান যে দিল্লী পুলিশের কমিশনার থেকে শুরু করে ওসি পর্যন্ত পদাধিকারীরা সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর অফিস (পিএমও)-তে খবরাখবর জানাবে। তারা গৃহমন্ত্রীকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখেই এ কাজ করবে এমনি ছিল নির্দেশ। ওয়াকিবহাল মহলের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী যত না দিল্লীর ইন্দিরা হত্যা পরবর্তী হিংসা নিয়ন্ত্রণের জন্য এই ফরমান তার থেকে বেশি শিখ নিধন যজ্ঞে পুলিশ যাতে সক্রিয়তা না দেখায় সেটিই ছিল গোপন অভিপ্রায়। বিখ্যাত প্রকাশনা সংস্থা Penguin Random House আগামী জুলাই মাসে নরসিমহা রাও পরিচালিত সরকারের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে বইটি প্রকাশ করতে চলেছে। যেখানে সরকার পরিচালনার নানা তথ্যের সঙ্গে সোনিয়া-রাও সম্পর্কের টানাপোড়েনের আরও বহু অজানা তথ্য সামনে আসতে চলেছে বলেই খবর।

আর এস এস কার্যকর্তাদের খুনের ছক দাউদের : এন আই এ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ আন্ডারওয়াল্ড ডন দাউদ ইব্রাহিম রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শীর্ষস্থানীয় কার্যকর্তাদের খুন করে দেশে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করার ছক কষছে। এছাড়া ডি-কোম্পানির খতম তালিকায় কয়েকটি গির্জা এবং কয়েকজন খৃষ্টান ধর্মগুরুও আছেন। সম্প্রতি খবরটি জানিয়েছে ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (এন আই এ)। যে ১০ জনকে এই কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এন আই এ তাদের নামে কয়েকদিনের মধ্যেই চার্জশিট ফাইল করবে। জানা গেছে নরেন্দ্র মোদী সরকার ক্ষমতায় আসার সঙ্গে সঙ্গেই এই পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল।

তদন্তে গোয়েন্দারা জানতে পারেন দাউদ-ঘনিষ্ঠ পাক নাগরিক জাভেদ চিকনা এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় বসবাসকারী জাহিদ মিলিয়ান আলিয়াসের কথা। এরাই হচ্ছে দাউদের নতুন পরিকল্পনার মাথা। এন আই এ এদের দু'জনকে খুঁজে বের করে ভারতের হাতে তুলে দেবার জন্য ইন্টারপোলকে নির্দেশ দিয়েছে। খবরে প্রকাশ, এন আই এ-র চার্জশিটে চিকনা এবং অলিয়াস-সহ দাউদের ঘাতক-টিমের প্রত্যেকেরই নাম আছে। দাউদের নাম রাখা হয়নি বটে কিন্তু এই ঘটনায় কোনোরকম যোগাযোগ থাকলে তার নাম অন্তর্ভুক্ত করে একটি সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট ফাইল করা হবে। চিকনা এবং আলিয়াসের বিরুদ্ধে রেড কর্নার নোটিস জারি করা হয়েছে।

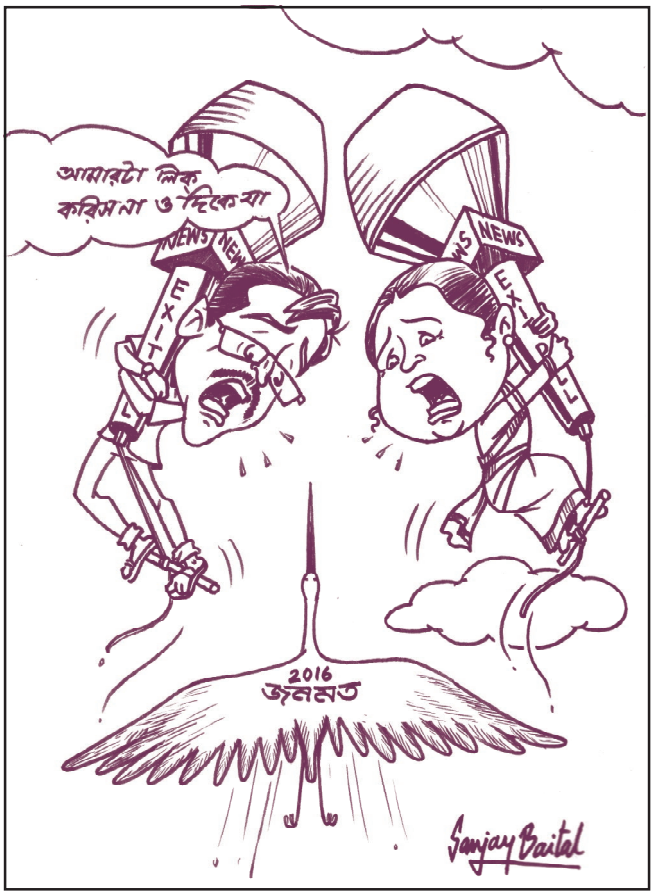

উবাচ

"যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এক সময় উৎকর্ষের কেন্দ্র ছিল, তা এখন বিশৃঙ্খলার কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। কর্তৃপক্ষের উচিত উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া।"

কেশরীনাথ ত্রিপাঠী
রাজ্যপাল, পশ্চিমবঙ্গ

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে।

"বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে স্বশাসনের অধিকার দেওয়া হয়েছে। তাই পড়ুয়াদের শাস্তির বিষয়ে সরকার হস্তক্ষেপ করলে তা 'প্যান্ডোরার বাক্স' খুলে দিতে পারে।"

স্মৃতি ইরানি
কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী

রাজ্যসভায় জে এন ইউ ছাত্রছাত্রীদের শাস্তি মুকুবের আর্জি প্রসঙ্গে

"যাদবপুরে আদর্শ আছে, রাজনীতি আছে, বড় বড় বিল্ডিং আছে, দেওয়াল জোড়া গ্রাফিতিও আছে। শুধু শিক্ষাটা চলে গিয়েছে।"

বিবেক অগ্নিহোত্রী
চলচ্চিত্র নির্মাতা

'বুদ্ধ ইন আ ট্রাফিক জ্যাম' ছবিটি প্রদর্শনের সময় যাদবপুর ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে ছাত্রছাত্রীদের হাঙ্গামা প্রসঙ্গে

"কেরলে এক ছাত্রীকে ধর্ষণ করে মেরে ফেলা হয়েছে। কিন্তু রাহুল গান্ধীর সেখানে যাওয়ার সময় নেই। অথচ সেখানে তাঁর দল ক্ষমতায় আছে। তিনি কিন্তু এক ছাত্রের আত্মহত্যা নিয়ে রাজনীতি করতে দু'বার হায়দরাবাদ গিয়েছিলেন।"

বেঙ্কাইয়া নাইডু
কেন্দ্রীয় সংসদবিষয়ক মন্ত্রী

"আমরা যা করি উনি তাই নিজের বলে চালিয়ে দেন।"

প্রধানমন্ত্রীর স্বচ্ছ-ভারত অভিযানের অনুকরণে জয়ললিতার স্বচ্ছ গ্রাম প্রকল্প প্রসঙ্গে

প্রকাশ জাভড়েকর
কেন্দ্রীয় তথ্যসম্প্রচার মন্ত্রী

এবারের ভোটে সেরার সেরা শিরোপাটি সাংবাদিকদের প্রাপ্য

গূঢ়পুরুষের কলম

এবার রাজ্যে মোটামুটিভাবে শান্তিপূর্ণ এবং অবাধ ভোটের জন্য অনেকেই নির্বাচন কমিশনকে প্রশংসা করেছেন। দলদাস পুলিশও তাদের উর্দির মর্যাদা রক্ষায় তৎপর ছিল। অথচ সব কিছুরই কারিগর ছিল সংবাদমাধ্যম ও তার কর্মরত সাংবাদিকরা। আমরা ক'জন তাঁদের কুর্নিশ জানিয়েছি বলুন? সাধারণ মানুষ যে এবার ভোট লুঠ রুখতে জোটবদ্ধভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন তা এককথায় অবিশ্বাস্য। অতীতে শাসকদলের দাদাগিরি রুখতে এমন মরিয়া প্রচেষ্টা দেখিনি। এটা সম্ভব হয়েছে সংবাদমাধ্যমের জন্য। শাসকদলের শাসানির বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মানুষ রুখে দাঁড়িয়েছে যখন তাঁরা জানতে পেরেছেন তাঁদের প্রতিবেশীরা সব ভয় সব হুমকিকে তুচ্ছ করে ভোটের লাইনে দাঁড়িয়েছেন। নিজের ভোট নিজে দিয়েছেন। ১৯ মে ভোটের ফলাফল ঘোষিত হওয়ার পর কোনো দলই এবার বলতে পারবে না যে ভোটের নামে রাজ্যজুড়ে প্রহসন হয়েছে। ব্যাপকভাবে রিগিং হয়েছে। স্পষ্টতই বিপাকে পড়েছে বর্তমান শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। কারণ, ক্ষমতায় থাকার সুবাদে পুলিশ, প্রশাসন এবং সমাজ -বিরোধীদের মাঠে নামিয়ে ভোটের দিন রিগিং করায় শাসকদলই। অতীতে সিপিএম এই কুকাজটি যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গেই করেছে। বামপন্থীরাই পথ দেখিয়েছিল কীভাবে সাধারণ মানুষের ভোটের অধিকার কেড়ে নিতে হয়। ভোটদাতাদের সচিত্র পরিচয়পত্র দেওয়ার সিদ্ধান্তকে আটকাবার মরিয়া চেষ্টা করেছিলেন জ্যোতি বসু ও তাঁর কমরেডরা। সিপিএম নেতৃত্ব চিরকালই মনে করে জনগণ হচ্ছে বরাহ সন্তান। এই বরাহ সন্তানদের নির্বাচন কমিশন সচিত্র পরিচয়পত্র দিলে তারা মাথায় চড়ে বসবে। নিজের ভোট নিজে দিতে চাইবে। আজ যখন বিমান বসু, সূর্যবাবুরা অবাধ নিরপেক্ষ ভোটের কথা বলেন তখন মনে হয় বলি যে 'আস্তে কন কত্তা, ঘুড়ায় শুনে হাসবে।' বিমানবাবু নিশ্চয় ভোলেননি যে ২০০৪ সালে লোকসভা ভোটের সময় নির্বাচন কমিশনের পর্যবেক্ষকদের দেখে নেওয়ার হুমকি দিয়েছিলেন তিনি। তাঁর বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করেছিল কমিশন।

এবার সাত দফার ভোটে নানা অনিয়ম বেনিয়মের প্রশ্নে মোট ৪৬ হাজার অভিযোগ জমা পড়েছিল কমিশনের দপ্তরে। শাসকদলের নেতানেত্রীদের বিরুদ্ধেও এত বিপুল সংখ্যায় পুলিশে অভিযোগ দায়ের করার ঘটনাও ঘটেনি অতীতে। এর জন্যই কুর্নিশ জানাতে হবে সংবাদমাধ্যমকে এবং সাংবাদিকদের। আমাদের বুঝতে হবে গণমাধ্যম বিশেষত টেলিভিশনের গুরুত্ব কতটা বর্তমান সমাজে। ভোট ভূতদের কার্যকলাপ নগ্নভাবে তুলে ধরেছে সাংবাদিকদের ক্যামেরা টেলিভিশনের পর্দায়। শাসকদলের অনুব্রত মণ্ডল, রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, উদয়ন গুহ, আবদুর রেজ্জাক মোল্লা, সোনালি গুহদের দাদাগিরি খোলাখুলিভাবে দেখিয়েছেন টিভির সাংবাদিকরা। নির্বাচন কমিশনকে ধন্যবাদ জানাই, কারণ কুকথা বলার জন্য কমিশন এদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নিয়েছে। যেমন, কলকাতার কাশীপুর—বেলগাছিয়া কেন্দ্রে ভোটের দিন কমিশনের বিরুদ্ধে কুকথা বলার জন্য শাসকদলের নেতা মহম্মদ আনোয়ার খানকে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেয় কমিশন। গত বছর সল্টলেকে পুরভোটে শাসকদলের সমাজবিরোধীদের অবাধ তাণ্ডবের ছবি ও খবর তুলে ধরেছিলেন সাংবাদিকরাই। তার জন্য পুলিশের উপস্থিতিতেই বেধড়ক মার খেতে হয়েছিল তাঁদের। তারই ফলশ্রুতিতে এবার লুম্পেনদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন সল্টলেকের সাধারণ মানুষ। যথেষ্ট সক্রিয়তা নিয়ে পাশে দাঁড়িয়েছে পুলিশ, নির্বাচন কমিশন। তাই আজ সল্টলেকের ভোটকে সেরার সেরা মডেলের তকমা দেওয়া হচ্ছে।

সারা বিশ্বেই সামান্য বেতনে কর্মরত সাংবাদিকরা তাঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করেন। তবে তৃতীয় বিশ্বের দেশে সাংবাদিকদের কাজটা যত কঠিন অন্যত্র ততটা নয়। ২০১৫ সালে তৃতীয় বিশ্বের দেশে মোট ৭২ জন সাংবাদিক খুন হয়েছেন। অধিকাংশই খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে। আমরা প্রতি বছর রাষ্ট্রপুঞ্জের ঘোষিত ওয়ার্ল্ড প্রেস ফ্রিডম ডে পালন করি। তবে তা নীরবে নিভৃতে। ভ্যালেন্টাইন ডে-র মতো ঘটা করে নয়। এ এক অদ্ভুত অনীহা। প্রাণে মেরে ফেলার হুমকিকে অগ্রাহ্য করে কাজ করার পরেও তাঁদের সাহসের মর্যাদা আমরা দিতে ভুলে যাই। সমাজের এই অবহেলার জন্যই সাংবাদিকদের উপর রাজনৈতিক আক্রমণ হয়েই চলেছে। পশ্চিমবঙ্গে কলকাতায় সাংবাদিকরা যতটা নিরাপদে কাজ করতে পারেন, জেলার সাংবাদিকরা তার ১ শতাংশও পারেন না। শাসকদলের কথা না বলাই ভাল। বিরোধী দলের নেতারাও কিন্তু ভোটের দিনটি ছাড়া বাকি পাঁচ বছর ঘুমিয়ে থাকেন। তাঁরাও ভুলে যান যে সাংবাদিকদের সঠিক খবর তুলে ধরতে না দিলে দেশের গণতন্ত্রই বিপন্ন হবে। সাংবাদিকরাই গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ। এবার এই রাজ্যের সাংবাদিকরা তা বাস্তবে প্রমাণ করেছেন। তাঁদের কোনো দল নেই। শক্তিশালী সংগঠন নেই। তবু তাঁরা সাত দফার ভোটে প্রেতের নৃত্য থামাতে লড়ে গেছেন। এই নৈরাজ্যের রাজ্যে এটাই একমাত্র আশা ভরসার কথা। তাই সল্টলেক নয়, সাত দফায় ভোটে সেরার সেরা শিরোপাটি রাজ্যের সাংবাদিকদেরই প্রাপ্য। ■

বাংলার ভাগ্যাকাশে দুর্যোগের ঘনঘটা!

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা,

ভোটের চাপে আপনাদের চিঠিই লেখা হয়নি। কেমন আছেন সবাই? তবে তার চেয়ে বড় প্রশ্ন কেমন থাকবেন?

ভয় পাচ্ছি আমরা দিদির জন্য। তিনি যা বলেন করে দেখান। এই যেমন তিনি বলেছিলেন ভোটের পরে ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে বুঝে নেবেন। ঠিক তেমনটাই তো শুরু হয়েছে।

যেমন কথা, তেমন কাজ। এটাই নিয়ম। নেতানেত্রীর কাজ পথ দেখানো। অনুগামীরা সেই পথ অনুসরণ করেন মাত্র। পথ বাতলে দিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভোটের প্রচারে বিরোধীদের ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে বুঝে নেওয়ার হুমকি দিয়েছিলেন। কাজ হচ্ছে কথা মতোই। তাঁর অনুসারীগণ দিকে দিকে বিরোধীদের বুঝে নিতে শুরু করে দিয়েছেন। কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে গুলি-বোমা নিয়ে হামলার ঘটনা চলছে প্রতিদিন। কখনও প্রাক্তন বিধায়কের বাড়ি লক্ষ্য করে বোমা ছোড়া হচ্ছে, কখনও আবার সরাসরি গুলিবিদ্ধ হচ্ছেন রাজনৈতিক কর্মীরা। হুমকি-শাসানির ঘটনা ঘটছে মুহুর্মুহু। হিংসা অব্যাহত পশ্চিমবঙ্গে। থামার কোনো লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না।

প্রথম দুই পর্বের ভোট বাদ দিলে পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন এবার মোটের উপর নির্বিঘ্নেই ঘটেছে। বিক্ষিপ্ত কিছু গোলমাল ঘটলেও বড়সড় কোনো ঘটনা ঘটেনি। যদিও 'শান্তি পূর্ণ' ভোটের এই সংজ্ঞাটি একান্তভাবেই পশ্চিমবঙ্গের সাপেক্ষে তৈরি। দেশের কোনো কোনো রাজ্যের নির্বাচনে এটুকু সন্ত্রাসের ছবিও ধরা পড়ে না। উন্নত গণতান্ত্রিক দেশে নির্বাচন সার্বিক অর্থেই উৎসব হিসেবে পালিত হয়। বুথে বুথে পুলিশি প্রহরা কিংবা আধাসেনার টহল এবং লাঠি সেখানে দেখা যায় না। নির্বাচন কমিশনকে সর্বক্ষণ টেলিভিশনে চোখ রাখতে হয় না সন্ত্রাস নিরীক্ষার জন্য। মানুষ সেখানে ভোটকেন্দ্রে যান এবং নিজের গণতান্ত্রিক অধিকারটি প্রয়োগ করে ফিরে আসেন।

পশ্চিমবঙ্গকে সেসবের সঙ্গে গুলিয়ে ফেললে অবশ্য ভুল হবে। ভোটে হিংসা-হাঙ্গামা, রক্তারক্তি, প্রাণহানি এখানে স্বাভাবিক ঘটনা। মানুষ যাতে ভোট দিতে না পারেন, যাতে তাঁদের ভোটকে ছাপ্পায় অনূদিত করা যায়, তার জন্য সংসদীয় গণতন্ত্রে 'বিশ্বাসী' রাজনৈতিক দলের কর্মীরা গ্রামে-গ্রামে ঘুরে ঘুরে ঘরে-ঘরে হুমকি দিয়ে যান। এখানে ন্যায্য ভোট রাজনৈতিক ভূতেরা গিয়ে দিয়ে দেয়। বুথে গিয়ে সাধারণ মানুষ আবিষ্কার করেন, তাঁর ভোট পড়ে গিয়েছে। এখানে শাসকদল চড়াও হয় বিরোধীদলের এজেন্টের উপর। খুনোখুনি হয়। তবে তৃণমূলের আমলেই আচমকা এমন ঘটতে শুরু করেছে ভাবলে ভুল হবে। পশ্চিমবঙ্গের দীর্ঘ রাজনৈতিক সংস্কৃতির অংশ হিসেবেই এসব ঘটনা ঘটে চলেছে। ভোটের দিন বোমার শব্দ, গুলির শব্দ, নিঃশব্দ হুমকি এখানে স্বাভাবিক। দিদি এসব বাম-দাদাদের থেকেই শিখেছেন। কংদাদারাও কম যাননি।

তবে ২০১৬ সালের নির্বাচনে এই সব কিছুর পরিমাণ চোখে পড়ার মতো কমেছে। মানুষ ভোট দিতে পেরেছেন এবং তার জন্য ধন্যবাদ প্রাপ্য বাহিনী-পুলিশ সহযোগে নির্বাচন কমিশনের সক্রিয় তত্ত্বাবধানের। প্রচারে শাসকদল স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং নির্বাচন কমিশন ক্ষণিকের অতিথি। এমনকী মুখ্যমন্ত্রীও বারবার সেটা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। ভোট-পরবর্তী হিংসার হুমকি মানে হুঁশিয়ারি মানে সতর্কতা তখনই প্রচ্ছন্নে দিয়ে রাখা হয়েছিল।

এখন কেউ বলতে পারবে না দিদি না জানিয়ে কিছু করেছেন। মনে রাখবেন তৃণমূল ভীতু দল নয়। সেই রঘু ডাকাতদের মতো। আগে চিঠি পরে ডাকাতি।

আগে হুমকি পরে মার। আর একটু সবুর করুন। ঘরে ঘরে ছেলে পাঠানো হবে। তারা গিয়ে 'ইয়ে' করে দিয়ে আসবে।

— **সুন্দর মৌলিক**

১৯১৬ থেকে ২০১৬

মুসলমান তুষ্টিকরণের শতবর্ষে কি কাটবে বাঙালির ঘুমঘোর?

অমল কান্তি বসু

পাহাড়তলির মাটিতে একদিন মুখ গুঁজে পড়েছিল যে মেয়েটি তাকে কি মনে পড়ে? ২১ বছরের উচ্চশিক্ষিতা সুন্দরী তরুণী। সায়নাইড খেয়ে জীবন ত্যাগ করার আগে সে চিরকুটে লিখেছিল 'ভারতমাতাকে' স্বাধীন করার জন্য অনেক পুত্র প্রাণ দিয়েছে, কিন্তু এখনও কোনো কন্যা প্রাণ দেয়নি বলেই আমার এই স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ।' মেয়েটির নাম প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার। কিন্তু তাঁর আত্মবলিদানের মাটি চট্টগ্রাম আজ কোথায়? কোথায় সেই লাহোরের মাটি? যে জেলের মাটিতে মধ্যরাত্রে চুপিসারে শুকদেব, রাজগুরু ও ভগৎ সিং-য়ের ফাঁসি দিয়ে মৃতদেহ পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল শতদ্রু নদীর ধারে? ফাঁসির আগেও যে কনডেমড মেলে বসে তারা গান গেয়েছিল 'মেরা রং দে বাসন্তী চোলা।' যে সিন্ধু নদের তীরে পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতার উন্মেষ ঘটেছিল, যে সিন্ধু নদের তীরে মহান বেদমন্ত্র রচিত হয়েছিল, দেশমাতৃকার কাছে যেটুকু নেওয়ার সেটি নেওয়া হয়ে গেছে বলে অন্নজল ত্যাগ করার পর তাঁর আদরের মেয়ে খাওয়াতে এলে যে সাভারকর বলেছিলেন 'খেতে পারি, কিন্তু তুমি কি আমাকে আমাদের সেই সিন্ধুনদ ফিরিয়ে দিতে পার?' সেই সিন্ধুনদ আজ কোথায়?

একে একে আমরা সব হারিয়েছি, তবুও আমরা নিদ্রিত। কোনো দেবদেবী নয়, অখণ্ড ভারতের মানচিত্র সামনে রেখে ধ্যান করা শ্রী অরবিন্দ আমাদের বলেছিলেন, 'ভারত বিভাজন সম্পূর্ণ কৃত্রিম। যেদিনই হোক আর যে ভাবেই হোক ভারতবর্ষ আবার অখণ্ড হবে'। তবুও আমরা ঘুমন্ত। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালক শ্রী গুরুজী ডান হাতে ব্যথা নিয়ে কাজ করছেন দেখে তাঁকে একজন কাজ করতে নিষেধ করায় বলেছিলেন 'শুধু হাতে নয়, যেদিন থেকে ভারত ভাগ হয়েছে সেদিন থেকে আমার দুই কাঁধে অসহ্য যন্ত্রণা।' চোখের কোলে টলটলে জল শ্রী গুরুজীর সেই ব্যথা কি অনুভব করি? আমরা নির্বিকার। তারই পরিণতিতে মুসলমান তুষ্টিকরণের শতবর্ষের ইতিহাস রচিত হয়েছে। মনে পড়ে কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশনের কথা? মঞ্চ থেকে মহম্মদ আলি 'বন্দেমাতরম্' গাইতে নিষেধ করলেন। সিংহ বিক্রমে ডি. ভি. পালুসকর বললেন, 'আমি পুরো গানটাই গাইব।' গাইলেনও তিনি। মহম্মদ আলি মঞ্চ ছেড়ে চলে গেলেন। সাংসদ ওয়াইসির মতো বহু মুসলমান তো বন্দেমাতরম্ গাইবে না বলে আজ হুঙ্কার দিচ্ছে। 'জনগণমন' গানে পাঁচটি স্তবক থাকলেও হিন্দুত্বের গন্ধ আছে বলে কেবল প্রথম স্তবকটিই গাওয়া হয়। দ্বিতীয় স্তবকটি :

'অহরহ তব আহ্বান প্রচারিত শুনি তব উদার বাণী
হিন্দু বৌদ্ধ শিখ জৈন পারসিক মুসলমান খৃষ্টানী
পূরব পশ্চিম আসে—তব সিংহাসন পাশে প্রেমহার হয় গাঁথা'

—এই গান গাইতে আপত্তি কোথায়?

এর উত্তর পেতে মুসলমান ইতিহাসের বীজ ও বিদগ্ধ ব্যক্তিদের মতামত জানা প্রয়োজন। গজনির সুলতান মামুদের দরবারের ঐতিহাসিক AL' utbi-র বিবরণীতে পাওয়া যায় 'মামুদ নগরের পর নগর জয় করে পৌত্তলিক কাফেরদের হত্যা ও অসংখ্য মন্দির ধ্বংস করে ইসলামের প্রতিষ্ঠা করেছে'। ড. আম্বেদকর বলেছেন, 'মহম্মদ বিন কাশেম তার কাকা ইরানের গভর্নর হাজ্জাদকে উপহার পাঠালেন দাহিরের ছিন্নশির, আর জানালেন 'দুর্গ দখল হয়ে গেছে। কাফেরদের হত্যা অথবা ধর্মান্তর করা হয়েছে, মন্দির ভেঙে গড়া হয়েছে মসজিদ' (Pakistan or the Partition of India– Page 55, 58)। আম্বেদকর আরও বলেছেন, পাকিস্তান সৃষ্টির উদ্দেশ্য দুটি। একটি প্রাথমিক। অপরটি খানিকটা দূরবর্তী। প্রাথমিক উদ্দেশ্য হচ্ছে পার্শ্ববর্তী মুসলিম দেশগুলির সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি মুসলিম রাষ্ট্র গঠন করা এবং পরবর্তী উদ্দেশ্য হচ্ছে হিন্দুস্থানকে (ভারতকে) আক্রমণ করে হিন্দুদের জয় বা পুনর্জয় করা এবং শেষ পর্যন্ত ভারতকে মুসলমান রাষ্ট্রে পরিণত করা (তদেব পৃ. ৩৭৬)। প্রবুদ্ধ ভারত এপ্রিল ১৮৯৯ (৯ম খণ্ড পৃ. ৪৮৪) লিখেছে, 'যখন মুসলমানেরা এদেশে আসিয়াছিল তখন ভারতে ৬০ কোটি হিন্দু ছিল। এখন আমরা ২০ কোটিতে পরিণত হয়েছি।' কেন? (ফেরিস্তা ৯ম খণ্ড পৃ. ৫২১)। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন প্রতিষ্ঠার সময় হিন্দু জাতি ও ধর্মকে রক্ষার তাই সংকল্প নিয়েছিলেন স্বামীজী।

দেগঙ্গা, খাগড়াগড়, কালিয়াচকের মতো অসংখ্য ঘটনার আঁধি ছেয়ে ফেলেছে বাংলার আকাশ-বাতাস। বিজেপি কটা সিট পাবে বা পশ্চিমবঙ্গে কে সরকার গড়বে, তার চেয়ে বড় কথা হলো পশ্চিমবঙ্গ থাকবে তো?

'আওয়ার মুন হ্যাজ ব্লাড ক্লটস' নামক পুস্তকে রাহুল পণ্ডিত কাশ্মীরি পণ্ডিতদের স্বদেশ হারানোর কথা বলেছেন। বিখ্যাত উপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, 'একদিন মুসলমানেরা লুণ্ঠনের জন্যই এদেশে আসিয়াছিল। রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য আসে নাই। সেদিন কেবল লুণ্ঠন করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, মন্দির ধ্বংস করিয়াছে, প্রতিমা চূর্ণ করিয়াছে, নারীর সতীত্ব হানি করিয়াছে, বস্তুত অপরের ধর্ম ও মনুষ্যত্বের উপর যতখানি আঘাত ও অপমান করা যায়, কোথাও কোনো সঙ্কোচ মানে নাই। মুসলমান যদি কখনও বলে হিন্দুর সহিত মিলন করিতে চায়, সে ছলনা ছাড়া আর কি হইতে পারে ভাবিয়া পাওয়া কঠিন।' এঁদের বোধোদয় হয়েছিল কিন্তু আমাদের? (বর্তমান হিন্দু মুসলমান সমস্যা, শরৎ রচনাবলী তৃতীয় খণ্ড পৃ. ৪৭২)

ভারতে তখন বালগঙ্গাধর তিলক অবিসংবাদিত নেতা। মান্দালয় জেলে নির্বাসিত হয়ে পাঁচ বছর ধরে শুধুমাত্র গীতার কর্মযোগ নিয়ে রচনা করলেন 'গীতারহস্য'। যে কর্মযোগে বলা হয়েছে ব্যক্তিগত স্বার্থে না হলে সমাজের অনিষ্টকারী ব্যক্তিদের হত্যা করা অধর্ম নয়, বরং সেটাই ধর্ম। এই ভাবনায় আলোড়িত ভারতবর্ষে গান্ধীজী ফিরলেন দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে। তাঁকে নেতৃত্ব নিতে হবে। তাই কেরলে শুরু হলো নির্বিচার হিন্দু হত্যা, গণধর্ষণ ও ধর্মান্তরকরণের তাণ্ডব, যেটি মোপালা বিদ্রোহ নামে পরিচিত ও যার পরিণামে শুধু মুসলমানদের জন্য আলাদা জেলা মোপালাস্তান নির্মাণ। তবুও গান্ধীর প্রশংসাবাণী। বললেন, 'ওরা ধর্মভীরু, ধর্ম যেমন শিখিয়েছে তেমন করেছে'। আম্বেদকর তাই বলেছিলেন, 'মুসলমানদের বোঝা যায় কিন্তু বোঝা যায় না গান্ধীর দৃষ্টিভঙ্গি।' এদিকে ধর্ম যাদের কাছে আফিম, পার্লামেন্ট শুয়োরের খোঁয়াড় সেই কমিউনিস্টরা ৪৬ সালের ডাইরেক্ট অ্যাকসান- এর গণহত্যার নায়ক সুরাবর্দীর সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলেছিল, 'আগে পাকিস্তান দিতে হবে, তবেই ভারত স্বাধীন হবে।' গান্ধীজীর সঙ্গে নোয়াখালির দাঙ্গা-বিধ্বস্ত এলাকায় যাওয়ার সময় সুচেতা কৃপালনী আত্মরক্ষার জন্য ব্লাউজের ভিতর সাইনাইড ক্যাপসুল নিয়ে গিয়েছিলেন। বাংলায় 'লেনিন আক্রান্ত' (আজিজুল হক, আজকাল ৩.৯.১৯৯৯) বলে যারা নিবন্ধ লেখে তারা তসলিমা আক্রান্ত হলে অথবা ১৪ বছরের মেয়ে ও তার মাকে এক সঙ্গে ধর্ষণের আর্তনাদ মসজিদের মাইকের আওয়াজ বাড়িয়ে শুনতে না দেওয়া হলেও সরীসৃপ হয়ে যায়। পুলিশের ডাইরেক্টর জেনারেল হয়ে সরকারি পদে অধিষ্ঠিত হয়েও নিষিদ্ধ 'সিমি' সংগঠনের সদস্য ও শ'দেড়েক মুসলমান নিয়ে মুসলিম ইন্সটিটিউট হলে নজরুল ইসলাম বলেন, 'আমাকে চাকরি থেকে সরিয়ে দিলে মুসলিম অ্যাকটিভিটিজ' শুরু করবো। এসব কথা সকলের জানা। কিন্তু 'সারে জাঁহাসে আচ্ছা হিন্দুস্থাঁ হামারা'র জাতীয়তাবাদী (?) মহান কবি ইকবালের 'শিকাওয়া' কবিতাটি মনে পড়ে?

বলিতে পার কি ভুলেও কি কেহ নিত তোমার নাম?
মুসলমানেরি বাহুর বলেতে পুরিয়াছে তব মনস্কাম।
কিন্তু হে প্রভু কে তোমার লাগি তুলেছে কৃপাণ দুর্নিবার?
কে রচেছে বল নতুন করিয়া শৃঙ্খলাহীন এ সংসার?
খায়বার দ্বার তুমিই বল না কার বাহুবলে পড়িল লুটি?
রোমক রাজের অজেয় নগরী কাহার বীর্যে পড়িল টুটি?
হাতে গড়া যত পাষাণ দেবতা করেছে কে গো ধূলিসাৎ?
সত্য বিরোধী কাফের দলের কে করেছে বল শোণিতপাত।

(ইকবালের কাব্য সঞ্চয়ন— মনিরুদ্দিন ইউসুফ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ)। মনে রাখা প্রয়োজন, কবি ইকবালের সভাপতিত্বেই মুসলিম লীগ ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ 'পাকিস্তান প্রস্তাব' গ্রহণ করে।

দেশভাগের অব্যবহিত পরে একটি ট্রেনের সমস্ত কামরায় মৃতদেহের স্তূপ 'নেহরুকে উপহার' হিসাবে পাঠানোর পর বা দিল্লীর ভাঙ্গি কলোনিতে মুসলমানদের হাত থেকে প্রাণ বাঁচাতে তিনদিন লুকিয়ে থাকার পরও গান্ধীজীর চৈতন্য হয়নি। তাই মুসলিম তুষ্টিকরণে তাঁর শেষ অবদান হিসাবে দিল্লীর রাজপ্রাসাদতুল্য সুরক্ষিত বিড়লা ভবনে তিনটি দাবি নিয়ে ১৩ জানুয়ারি ১৯৪৮ সালে শুরু করলেন অনশন। সেগুলি হলো— (১) শীতের রাত হলেও মসজিদে আশ্রয় নেওয়া হিন্দু উদ্বাস্তুদের তাড়িয়ে দিতে হবে। (২) ভারতের সঙ্গে যুদ্ধরত হলেও পাকিস্তানকে দিতে হবে ৫৫ কোটি টাকা। (৩) হিন্দু-শিখ নেতাদের লিখিতভাবে মুসলমানদের নিরাপত্তার গ্যারান্টি দিতে হবে। ফলে জীবিত গান্ধীর চেয়ে মৃত গান্ধী কংগ্রেসের সম্পদে পরিণত হয়ে মুসলিম তুষ্টিকরণের সেই ট্র্যাডিশন আজও বজায় রেখেছে। তাই রামমোহন, রবীন্দ্রনাথ, নেতাজী নয়; বাবর, আওরংজেব, লাদেন মুসলমানদের আদর্শ পুরুষ, জাতীয় বীর।

ঝড়ের আগে আসে আঁধি। দেগঙ্গা, খাগড়াগড়, কালিয়াচকের মতো অসংখ্য ঘটনার আঁধি ছেয়ে ফেলেছে বাংলার আকাশ-বাতাস। বিজেপি কটা সিট পাবে বা পশ্চিমবঙ্গে কে সরকার গড়বে, তার চেয়ে বড় কথা হলো পশ্চিমবঙ্গ থাকবে তো? তাই চলতে হবে জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রভক্তদের ডাক্তারজী ও গুরুজীর দেখানো পথে।

একক শক্তিতে একবার বলীয়ান হয়ে গেলে মুসলমানরা কারও দিকে আর ফিরেও তাকায় না। দলিত স্বার্থ রক্ষায় আম্বেদকরের রিপাবলিকান পার্টি শেষ পর্যন্ত 'দলিত মুসলিম সুরক্ষা মহাসঙ্ঘ' নামে হাজি মাস্তানের হাতে চলে যায়। (দত্তোপন্থ ঠেংড়ী— তত্ত্বজিজ্ঞাসা- পৃ. ১২৫)। একক শক্তিতে বলীয়ান বাংলার মুসলমান নেতৃত্ব আঁধি কাটিয়ে ঝড় তুলতে তাই সক্রিয়। তাই করণীয় হলো শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, ভোরের পাখির মতো গান গেয়ে যারা আমাদের ঘুম ভাঙিয়েছিল সেই প্রীতিলতাকে কথা দিতে হবে, তুমি যে মাটিতে মুখ গুঁজে পড়েছিলে তোমার প্রিয়জনেরা আবার সেখানে ফিরে গিয়ে সেই মাটিকে চোখের জলে ভিজিয়ে সেই ভেজা মাটিকে চুমু খেয়ে তোমাকে স্মরণ করবে। লাহোরের যে জেলে শুকদেব, রাজগুরু ও ভগৎ সিং-য়ের ফাঁসি হয়েছিল সেই মাটিকে স্পর্শ করে ও সেই মাটি নিয়ে তিলক কেটে কথা দিতে হবে, লাহোরকে আমরা 'শহিদতীর্থ' বানাব। সিন্ধু নদের জলে পিতৃতর্পণ করে আমাদের প্রতিজ্ঞা নিতে হবে আমাদের পবিত্র সিন্ধু নদ আবার ফিরিয়ে আনার। এই একটিমাত্র পথেই কাটবে বাঙালির ঘুমঘোর। ■

সরস্বতী নদী কি সত্যিই হারিয়ে গেছে?

দেবীপ্রসাদ রায়

''গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি
নর্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেহস্মিন্ সন্নিধিং কুরু।।''

—সকালে ঠাকুর (গৃহদেবতা) স্নান করানোর সময় মা'র মুখে এই মন্ত্রোচ্চারণ সূত্রে সরস্বতী নদীর নাম শুনি ছোটবেলায়। স্কুলে মাস্টারমশাই ইতিহাস পড়াতে গিয়ে বলেছিলেন এই সরস্বতী নদীর তীরে আর্যাবর্ত বা ব্রহ্মাবর্ত যা কিনা আর্যদের বাসভূমি ছিল সেখানে গড়ে উঠেছিল বৈদিক সাহিত্যসভ্যতা। সরস্বতী নদী এই সভ্যতার সৃষ্টি ও পুষ্টির কারণ বলে বেদ ও বেদানুসারী গ্রন্থসমূহে এই নদীর বহু উল্লেখ ও বন্দনা আছে। আমরা তার কিছুই জানতুম না, জানতে দেওয়া হয়নি সুকৌশলে। আমাদের ইতিহাস পাঠক্রমে বিদেশি শাসন ও শোষণের স্বার্থে হীনমন্যতাবোধ সৃজনক্ষম মেকলীয় শিক্ষানীতির রূপায়ণের জন্য। একটু উঁচু ক্লাশে আবার শুনেছি সরস্বতী নদীর নাম, রবীন্দ্রনাথের ছান্দোগ্য উপনিষদ-আশ্রয়ী কবিতা 'ব্রাহ্মণ' এ :

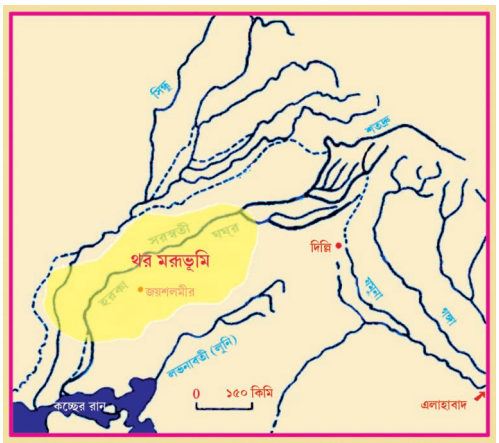

''অন্ধকার বনচ্ছায় সরস্বতী তীরে অস্ত গেছে সন্ধ্যা সূর্য...''। ব্যস তারপর আর নয়। আমাদের সভ্যতা সংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে যে নদী 'দেবী'র পর্যায়ে আমাদের অন্ধকারে রাখা হয়েছিল অনুসৃত বহিরাগত আর্য আক্রমণ তত্ত্বভিত্তিক ইতিহাসকে গলাধঃকরণ করিয়ে। ভারতীয় জনসাধারণের মনের মধ্যে সেই সুপ্রাচীনকালে প্রবাহিত বিশাল সরস্বতী নদীর স্মৃতি কথিত হলেও তা নিয়ে কোনো চর্চা, গবেষণা ব্যাপকার্থে অনুপস্থিত ছিল।

হঠাৎই গোটা দেশ নাড়া খেল বিগত শতাব্দীর সত্তরের দশকের শুরুতেই যখন আমেরিকার উপগ্রহ 'ল্যান্ডস্যাট' এবং ফ্রান্সের উপগ্রহ 'স্কাট' রাজস্থানে মরুর গভীরে নদী খাতের মতো কিছু চিহ্ন পেল। তাহলে কি এগুলি মরুভূমিতে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া সরস্বতী নদীরই খাত, দেহাবশেষ? ভারতীয় বিজ্ঞানীমহলেও নতুন করে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হলো। কারণ ঋকবেদ থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত এমনকী পরবর্তীকালে 'মেঘদূত' কাব্যগ্রন্থ-সহ বিভিন্ন গ্রন্থে সরস্বতী নদীর উল্লেখ আছে। যে প্রাণবন্তভাবে সরস্বতীর বর্ণনা আছে তাকে এড়িয়ে যাওয়া যায় না। তবুও আর্য আক্রমণ— 'তত্ত্ব' সৃষ্ট বিভ্রান্তির কবলে পড়ে আমরা ভুলতেই বসেছিলাম আমাদের দেশের সুপ্রাচীন ইতিহাসের সঙ্গে সরস্বতী নদীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা।

আমেরিকা ও ফ্রান্সের উপগ্রহ সংকেত দেখে আমাদের দেশেও যোধপুর এবং আমেদাবাদে ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ সেন্টার (আই এস আর সি)-গুলির উদ্যোগে উপগ্রহ ছবি দেখে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বিজ্ঞানী যশপাল বললেন ছবিতে পাওয়া দাগগুলি শুকিয়ে যাওয়া নদী সরস্বতীরই খাত। আই এস আর সি-র রিমোট সেনসিং উপগ্রহ আই সি এবং আই ডি-র ছবি তা সুস্পষ্টভাবে জানাল। শুধু তাই নয় ভূগোলবিদ, হিমবাহবিশেষজ্ঞ, সেন্ট্রাল-গ্রাউন্ড ওয়াটার কমিশন, ভাবা অ্যাটমিক রিসার্চ সেন্টার সবাই বিভিন্ন দিক নিয়ে মাথা ঘামাতে থাকলেন, পায়ে হেঁটে 'ট্রেকিং' করাও হলো জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার ড. এম কে পুরী চিহ্নিত সরস্বতী নদীর উৎস হিমবাহ বন্দরপুচ্ছ থেকে সমুদ্রগামী সরস্বতী নদীর প্রবাহ পথ ধরে। ঋকবেদেই (৭,৯৫,২) এই প্রবাহ পথের নির্দেশ ছিল :

'একা চেত্য সরস্বতীনদীনাং শুচির্যতী গিরিভ্য আসমুদ্রাৎ।
রায়শ্চেতন্তী ভুবনস্য ভূরে-ঘৃতং পয়সা দুদহে নাহকার।।

সরস্বতী নদীর প্রবল অস্তিত্ব বর্ণনায় বহু ঋকের একটি ভরদ্বাজ ঋষির (৬,৬১,২)—

ইয়ং স্তুষ্মোভির্থিসখা ইবারুজৎ সানু গিরীনাং তবিষেভিরূর্মিভিঃ।
পমিবতঘ্নীমবসে সুবৃক্তিভিঃ সরস্বতীসা বিমসেম ধিতিভি।।

—এ নদীরূপী সরস্বতী মৃণাল খননকারীর ন্যায় প্রবল ও বেগবান তরুপ সহকারে পর্বত সানুসকল ভগ্ন করেছেন। আমরা রক্ষার নিমিত্ত স্তুতি ও যজ্ঞ দ্বারা উভয় কুলনাশিনী সরস্বতীর পরিচর্যা করছি।

বশিষ্ঠ ঋষি আবার ঋক ৭,৯৫,১-তে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছেন—

প্র ক্ষোদসা ধায়সা সস্র এষা সরস্বতী ধরুণসয়েসী পূঃ।
প্রবাবধানা রথ্যেব যাতি বিশ্বা অপোমহিনা সিন্ধুরন্যাঃ।।

—এ সরস্বতী অয়োনির্মিত পুরীর ন্যায় ধরিয়িত্রা হইয়া উদকের সহিত প্রবাহিতা হইতেছেন। তিনি অন্য সমস্ত স্যন্দনশীল জলকে মহিমা দ্বারা বাধা প্রদান করতঃ পথের ন্যায় গমন করিতেছেন। বাস্তবপক্ষে ঋকবেদেই ৭১ বার সরস্বতী নদী প্রসঙ্গ আছে। বাল্মীকি রামায়ণে আছে,

ভরত মামাবাড়ি কেকয় থেকে রামের বনবাসের খবর পেয়ে দ্রুত অযোধ্যা আসার পথে সরস্বতী গঙ্গা সঙ্গম স্থল পেয়েছিলেন।

মহাভারতে প্রায় সমস্ত পর্বে সরস্বতী নদীর উল্লেখ আছে মোট ২৪৮ বার কমপক্ষে। কর্ণ নিধনের পর শল্যকে সেনাপতি করায় হতোদ্যম কৌরব সেনা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলো সরস্বতী নদীতে স্নান করে— ''আকাশে বিদ্রুমে পুণ্যে প্রস্থে হিমবতঃ স্তভে।

অরুণাং সরস্বতীং প্রাপ্য পযুঃ সশুশ্চ তে জলম্।।

কৌরব সেনারা বৃক্ষলতাহীন শূন্যময় পবিত্র ও নিরুৎপতে হিমালয়পর্বতের সমতলভূমিতে সন্ধারাগে অরুণবর্ণা সরস্বতী নদী পাইয়া তাহার জলপান এবং সেই জলে স্নান করিলেন।

বলরাম কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের শুরুতে সমুদ্র থেকে সরস্বতী নদীর তীর ধরে কুরুক্ষেত্র হয়ে উৎস প্লক্ষপ্রস্রবণে গেছিলেন—

প্রভাবঞ্চ সরস্বত্যাং প্লক্ষপ্রস্রবনং বলঃ

সংপ্রান্তঃ কারবপনং ত্রবরং তীর্থমুত্তমম্।।

বনবাসে বেরিয়ে পাণ্ডবরা সরস্বতীতীরস্থ কাম্যকবনের দিকে গেছলেন পশ্চিমমুখী হয়ে—

সরস্বতী দৃশদ্বতৌ যমুনাঞ্চ নিষেব্যতে

যযুর্বনেনৈব বনং সততং পশ্চিমাদিশম্।।

ততঃ সরস্বতী তীরে সমেযু মরুধন্বসু

কাস্যকং নাম দদৃশুর্বণমং মুনিজন প্রিয়ম্।।

এমনকী অনেক পরে মেঘদূতেও সরস্বতী নদীর উল্লেখ আছে—

হিত্বা হালামভিমতরসাং রেবতী রোচনাঙ্কাং

বন্ধুপ্রীতবা সমরবিমুখা লাঙ্গনীযাঃ সিষেবে।

কৃত্বা তারসামভিগমপাং সৌম্য সরস্বতীনাং

মন্তঃ শুদ্ধস্তমপি ভবিতা বর্ণমাত্রেন কৃষ্ণ।।

বন্ধুপ্রীতির জন্য সমরবিমুখ হলধর বলরাম রেবতীর নয়ন

প্রতিবিম্বিত হয়েছে এমন এবং আস্বাদ যার এমন হাশ নামক সুরা পরিত্যাগ করে যে জলরাশির তীরে বৈরাগ্যবশত বাস করছিলেন, হে সৌম্য সেই সরস্বতী জলধারা অভিগমন করে তুমিও অন্তরে বিশুদ্ধ হবে যদিও তোমার গায়ের রঙ্ কালো থাকবে (পূর্বমেঘ)

অবৈজ্ঞানিক, অনুমানভিত্তিক আর্য আক্রমণ তত্ত্ব এবং তদনুযায়ী বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনার কাল নির্ধারণে ম্যাক্সমুলারের মত যাঁরা গ্রহণ করতে পারেননি তাঁদের সনিষ্ঠ গবেষণায় কিন্তু সরস্বতী নদীর অস্তিত্ব অস্বীকার করা হয়নি।

এদের মধ্যে কয়েকজন— ক্রিশ্চিয়ান লার্সেন, মান ওরেলস্টাইন, সি এফ ওল্ডহাম, জেন-ম্যাকেনতোষ, মাইকেল ডানিন প্রমুখ ১৭৬০ সালে Bryce, Collicr এবং Schnits প্রকাশিত Libray Atlas এর একটি মানচিত্রে দেখানো হয়েছে যে সরস্বতী নদী পাঞ্জাবে ঘগ্গরের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে— এমনকী এখনও মরসুমি জলে পূর্ণ হয়ে 'সুরসুতী'র প্রবাহ দেখা যায়। জেমস রেনেল নামে একজন ইংরেজ ভূগোলবিদ তাঁর মানচিত্রেও ওই ভাবেই সরস্বতীকে দেখিয়েছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে সাতজন স্থানবিবরণ-বিশেষজ্ঞ মরসুমি নদী ঘগ্গরের এর খাত জরিপ করে দেখেছেন ঘগ্গর শিবলিক থেকে নীচের দিকে বিশেষভাবে প্রশস্ত হয়ে মরসুমি জল বহন করে। প্রথম যে গবেষক মিলিত ঘগ্গর সরস্বতীকে বৈদিক সরস্বতী নদীর দেহাবশেষ মনে করেন তিনি হলেন ফরাসী ভূগোলবিদ লুইস- ভিভিয়ান দ্য সেন্ট মার্টিন যিনি ১৮৮৫ সালে ঋকবেদ মন্ত্র নির্দেশিত ভাবে উত্তরপশ্চিম ভারতের বিশদ ভূগোল রচনা করেছিলেন। পরবর্তীকালে সমস্ত ভারততত্ত্ববিদ এটি গ্রহণ করেছিল। পরে এর সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন সামশুল সিদ্দিকী এবং জার্মানির হারবার্ট উইল হেলমি। ১৯৪১ সালে বিখ্যাত ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ সংস্কৃতজ্ঞ মাক ওরেল স্টাইন পাকিস্তানের চোলিস্তান যা কিনা থর মরুভূমিরই সম্প্রসারণ যেখানে ব্যাপক অনুসন্ধান চালিয়ে ঘগ্গর নদীর শুষ্ক খাত যা হাকরা নামে পরিচিত সেখানে হরপ্পা সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কার করেন। পরবর্তীকালের প্রত্নতত্ত্ববিদদের খনন কার্যের ফলে ঘগ্গর- হাকরার যা কিনা সরস্বতী নদীখাতই সেখানে প্রাচীন জনপদের বহু নিদর্শন আবিষ্কার করেন। সিন্ধু-সরস্বতী অববাহিকায় এর ফলে প্রায় ২৫০০ আবিষ্কৃত জনপদের (হরপ্পার সমসাময়িক) মধ্যে প্রায় ২০০০ এর কাছাকাছি সরস্বতীর তীরেই অবস্থিত। ফলত অনেকেই এখন সিন্ধু সভ্যতাকে সরস্বতী-সিন্ধু সভ্যতা আখ্যা দিতে যুক্তিসঙ্গত ভাবেই আগ্রহী। বস্তুতপক্ষে আর্যসভ্যতা এবং সরস্বতী নদী যে প্রাচীনত্বের দাবি নিয়ে বহুমুখী কারণে আজ উপস্থিত এবং প্রায় আর্য আক্রমণ তত্ত্বকে একেবারেই খারিজ করে দিয়েছে। কিন্তু তা মেনে নিতে যাঁরা পারেননি তারা কিন্তু সমানে নানা কুযুক্তিতে সরস্বতী নদীকে নিছক কল্পনার বস্তু বলে সোচ্চার হয়ে আসছেন। এদের মধ্যে একজন মার্কসিস্ট ঐতিহাসিক ইরফান হাবিব। কারণ সরস্বতী নদীর অস্তিত্ব স্বীকার করলে 'বেদ' এর আর্য আক্রমণের স্বনির্ভর কালনির্ণয় নস্যাৎ হয়ে যায়। যদিও ম্যাক্সমূলার স্বয়ং ১৮৭১ সালে তাঁর গ্রন্থ 'A History of Ancient Sanskrit Literature' (১৮৫৯)-এ বর্ণিত 'আর্যআক্রমণ তত্ত্ব' খারিজ করেন। তবুও মেকলে-নীতির বাহক ঐতিহাসিকরা সত্যকে স্বীকার করতে চাননি। এমনকী কেউ কেউ সরস্বতী নদীকে আফগানিস্থানের 'হরবগস্বাতি' নদীর সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে একটি হ্রদে এসে তার পরিসমাপ্তি দেখান হাস্যকর ভাবে। কারণ সরস্বতী নদী যে সমুদ্রে এসে মিলিত হয়েছিল তা নিশ্চিত ভাবে প্রমাণিত হয়েছে। কেউ কেউ আবার সরস্বতী নদীকে একেবারে অস্বীকার করতে অসমর্থ হয়ে তাকে সিন্ধুনদীর সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু আজ এটি প্রমাণিত সত্য— যা ঋকবেদেও আছে, সরস্বতী ও সিন্ধু কখনোই মিলিত হয়নি— তারা আলাদা আলাদা ভাবে আরব সাগরে মিশেছে।

এখন সরস্বতী নদীর মূল ধারাটির পথ নির্দিষ্ট করা গেছে প্রচ্ছদ চিত্র। নানা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে, ভূস্তরের উৎক্ষেপণের ফলে সরস্বতীর ধারা পথ পরিবর্তন করেছে সম্ভাব্য প্রধান পরিবর্তনগুলি দেখানো হয়েছে।

জ্যোতির্বিজ্ঞানী ভি. ভি. কেতকর তৈত্তরীয় ব্রাহ্মণের একটি রচনার সূত্র ধরে বৃহস্পতি গ্রহের আবিষ্কার কাল এবং সরস্বতী নদীর মরুভূমিতে বিলুপ্তির সময় পেয়েছেন খৃঃপূর্ব ৭৫০০ বছর। আসলে বিভিন্ন জলধারার সঙ্গে পুষ্টীকরণ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়া, আবহমণ্ডলের প্রায়শ

প্রতিকূলতা, প্রাকৃতিক বিপর্যয় ইত্যাদি কারণে একাদিক্রমে না হলেও সরস্বতী স্রোতধারা শুকিয়ে আসছিল। বলরামের যাত্রাপথের স্থানে স্থানেও সরস্বতী নদী হারিয়ে গেছে জলাজমিতে, ভিজেমাটিতে, আবার কিছু পরে ভূপৃষ্ঠে দেখা গেছে। বন্দরপুছ হিমবাহ থেকে মূলধারা কীভাবে সমুদ্রে এসে মিলেছে তা দেখানো হয়েছে। বন্দরপুছ থেকে নেমে আসা হিমবাহ সুপীন নদী যেটি আসলে সরস্বতীর প্রথম স্রোত নেটওয়ার গ্রামের কাছে আর একটি স্থানীয় নদী রুপিন-এর সঙ্গে মিলিত হয়ে বৈদিক তামস নদী বা এখনের টনস্ নদী তৈরি করেছে। টনস নদীই আদি বদরী দিয়ে সমতলে অবতরণ করেছিল, কিন্তু সে পথ এখন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বিধ্বস্ত। বিকল্প রাস্তায় টনস নদী দেরাদুন থেকে চক্রাকার বসন্তায় কালসিরা গ্রামের কাছে যমুনায় মিশেছে। এই প্রাকৃতিক বিপর্যয় ছিল কোনো ভূমিকম্প যা ২৪৫০ খৃঃপূর্বাব্দে ঘটেছিল। এটা ঘটার বেশ কিছু নিদর্শন পাওয়া গেছে। রাজস্থান, পাঞ্জাবে বেশ কিছু প্রশস্ত খাত (২ কিমি থেকে ১০ কিমি) যে কোনো অনুসন্ধিসু মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে। এই খাতগুলিই প্রলুব্ধ করেছিল ওরেনস্টাইনকে যিনি সংস্কৃত ইতিহাস- কাব্য 'রাজতরঙ্গিনী' আবিষ্কার করেছিলেন— অনুবাদ করেছিলেন। বেশ কিছু প্রবাহ পথে সরস্বতী প্রবাহিত হয়েছে কালান্তরে। প্রবোধ সান্যালের 'উত্তর হিমালয় চরিত'-এ নাঙ্গাপর্বত ভেদ করে সরস্বতী নদীর নির্গমন বর্ণনা করেছেন। সরস্বতী নদীর চারটি সম্ভাব্য ধারাপথ দেখানো হয়েছে। প্রথমটি কুরুক্ষেত্র হয়ে আরাবল্লী পর্বতশ্রেণীর পাশ দিয়ে জাবরমতির সঙ্গে মিলে খাম্বার উপসাগর সময়কাল এক লক্ষ থেকে ২৪০০০ বছর। দ্বিতীয়টি কুরুক্ষেত্র থেকে পুষ্কর হয়ে লুনি নদীর সঙ্গে মিলে কচ্ছের মোহনা— প্রথম বদ্বীপ। এটি সময়কাল ২৪০০০ থেকে ৬০০০ খৃষ্টপূর্বাব্দ। তারপরের পথ আরো পশ্চিম দিকে সরে গিয়ে দক্ষিণ রাজস্থান ঘুরে এসে গুজরাটের পঞ্চভদ্রের কাছে আবার লুনি নদীর সঙ্গে মিলে কচ্ছের মোহনা। এটি কচ্ছের দ্বিতীয় বদ্বীপ। সময়কাল খৃঃপূঃ ৬০০০ বছর থেকে ২৪৫০ খৃষ্টপূর্বাব্দ। চতুর্থ যাত্রাপথ হরিয়ানা (ঘর্ঘর নদী) পাঞ্জাব হয়ে আজকের পাকিস্তানে ঢুকে ভাওয়ালপুর জেলায় মীরগড় হয়ে রাইনি নদী উৎপন্ন করে সিন্ধু নদীর সমান্তরাল হয়ে (রাইনি নদী, পূর্ব নারা নদী, মিহরান নদী) আবার রাজস্থানে প্রবেশ এবং লুনি নদীর সঙ্গে মিলিত হয় কচ্ছের মোহনায়।

সরস্বতী নদী এখনো আছে কীভাবে? বৈদিক সরস্বতী নদী যে ছিল তার অনেক রকম বিশ্লেষণে আজ প্রমাণিত সত্য। কিন্তু আজও কি আছে? উত্তর আছে। যে কেউই বদ্যিনাথের কাছে মানা গ্রামে এটি চাক্ষুষ করতে পারবেন। মানা গ্রামে আছে ব্যাস গুহা, গণেশ গুহা, কেশব প্রয়াগ। ডান দিকে ব্যাস গুহা, গণেশ গুহাকে রেখে উপরে উঠলে বাঁদিকে কেশব প্রয়াগে সরস্বতী নদী অলকানন্দাতে মিশেছে বা বিলীন হয়েছে অলকানন্দার। অথচ তার অল্প দূরেই পর্বতের বিশাল বিশাল শিলাখণ্ডের মাঝখানে ফাঁক ফোকর দিয়া সশব্দে সগর্জনে নৃত্যোন্মত্তা দুগ্ধধবল সরস্বতী নেমে আসছে। তার গর্জনে কানের কাছে মুখ রেখে কথা না বললে কথা শোনা যায় না। ইন্টারনেটে ভিডিও চিত্রে এই গর্জন শোনা যায়। সরস্বতীর অলকানন্দার গর্ভে বিলীন হওয়ার একটি প্রচলিত কাহিনি আছে। মহাভারত রচনাকালে ঋষি ব্যাসদেব তাঁর রচিত বিশাল কাব্যখানি লিপিবদ্ধ করার জন্য আহ্বান করেছিলেন গণেশকে। গণেশ শর্ত দিয়েছিলেন তাঁর লেখনী থামতে দেওয়া চলবে না, অনর্গল বলে যেতে হবে। অন্য দিকে ব্যাস শর্ত দিয়েছিলেন তাঁর রচনার অর্থ না বুঝে লিপিবদ্ধ করা চলবে না। কাজ শুরু হলো। ব্যাসদেব তাঁর রচনা বলতে লাগলেন এবং গণেশ তা লিখতে শুরু করলেন। কিন্তু সরস্বতী নদীর উচ্ছল উদ্দাম নৃত্য শব্দে ব্যাস মনসংযোগ করতে পারছিলেন না। বার বার বারণ করা সত্ত্বেও সরস্বতী তার সশব্দগীত সংবরণ না করাতে ক্রুদ্ধ ব্যাস শাপ দিলেন সরস্বতীকে নিজ সত্তা হারিয়ে অলকানন্দার বুকে বিলীন হওয়ার। সত্যিই সরস্বতী বিলীন হলো একেবারে নীরবে অলকানন্দার বুকে— অথচ তার আগে একটু দূরেই সে সশব্দে সগর্জনে দৃশ্যমান। এই অলকানন্দাই সরস্বতীকে বহন করে নিয়ে গেছে হরিদ্বার হয়ে এবং প্রয়াগে (এলাহাবাদে) যমুনার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। কাজেই এলাহাবাদে সঙ্গমে গঙ্গা যমুনার সঙ্গে সরস্বতীও প্রবহমানা থাকে।

মাটির গভীরের সরস্বতী নদীর জলের স্পর্শ নিতে পারি আমরা ১৯৯৮ সালে সেন্ট্রাল গ্রাউন্ড ওয়াটার কমিশন সরস্বতীর শুকিয়ে যাওয়া বুকে চব্বিশটি গভীর কুয়ো ড্রিল করে এবং আশানুযায়ী ২৩টি কুয়োতে স্বাদু এবং পেয় জলের সন্ধান পায়। সেই জল পরীক্ষা করার পর জানা যায় এই জল ৮ থেকে ১৪ হাজার বছরের পুরানো। শুধু তাই নয়, আইসোপোটপ পরীক্ষা করে ভাবা এটমিক রিসার্চ রায় দিলেন— এই জল এসেছে হিমালয়ের গ্লেসিয়ার থেকে। কুয়োগুলির গভীরতা মাত্র ১৪০ মিটার বা তার চেয়েও কম। বৈদিক সরস্বতী নদীর উৎস যে হিমালয়ই তার আরো প্রমাণ উত্তরোত্তর ভাবে পাওয়া যাচ্ছে। প্রত্নসরস্বতীর খাতের মূলধারার কিছু দূরে হরিয়ানার কালাপৎ অঞ্চলে কলিলমুনির আশ্রমে একটি প্রাচীন সরোবরের পঙ্কোদ্ধারের সময় দুর্গন্ধমুক্ত মিষ্টি জল উঠে আসে, যদিও অঞ্চল লভ্য স্বল্প পরিমাণ জলটিও লবণাক্ত। কুরুক্ষেত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে ওই জল নিয়ে পরীক্ষার পর জানা গেছে ''The heaky mineral Suite of the Sarovar thus contains corundum, brookite and fitanite in addition to the heavy minerals from the Siwalik Group of N-W India... The heavy mineral assemblage of the Sediments coming out with water...reveals that the Sediments have a definite Higher Himalayan in pat." মার্কসিস্ট ঐতিহাসিকদের পছন্দ না হলেও সরস্বতী নদী নিয়ে গবেষণা ব্যাপক ভাবে হওয়া প্রয়োজন। মাটির গভীরে সরস্বতী নদীর যে জল বন্দী হয়ে আছে তাকে আবার ভূপৃষ্ঠে আনার উদ্যোগ দেশবাসীর দ্বারা অভ্যর্থিত হবে।

গ্রন্থসূত্র :

(১) ঋক্‌বেদ সংহিতা—হরফ প্রকাশনী। (২) মহাভারত— হরিদাস সিদ্ধান্ত অনুবাদ। (৩) রামায়ণ— বাল্মীকি। (৪) মেঘদূত— কালিদাস। (৫) Imaging River Saraswati—Irfan Habib.

(লেখক বাঁকুড়া ক্রীশ্চান কলেজের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান)।

বৈদিক সরস্বতী নদী

অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

স্বপন দাশগুপ্ত

সরস্বতী নদী ভারতের একটি বহুবর্ষজীবী নদী। এই নদী ভারতীয় সভ্যতার ও সংস্কৃতির আত্মাস্বরূপ। বস্তুত সরস্বতী নদী ও ভারতীয় সভ্যতা একে অপরের সঙ্গে অত্যন্ত দৃঢ় ও গভীরভাবে জড়িত। ভারতীয় সংস্কৃতিতে সরস্বতীর প্রভাব অনস্বীকার্য। বৈদিক সাহিত্যে এই সরস্বতীকে একটি পবিত্র নদীরূপে বর্ণনা করা হয়েছে— 'অম্বিতমে, নদীতমে, দেবীতমে সরস্বতী'।

ঋকবেদে বহুবার এই নদীর উল্লেখ রয়েছে। এই নদীতীরেই গড়ে উঠেছিল আর্যসভ্যতা। এই নদীর তীরভূমিতেই ঋষিমুনিরা আশ্রম নির্মাণ করে সারা বৎসর বেদমন্ত্র উচ্চারণ করতেন বলে সরস্বতী পবিত্র নদীর সম্মান অর্জন করেছিল।

ক্রমে সরস্বতীকে দেবীরূপে বন্দনা আরম্ভ হয়। শুধু বৈদিক যুগে কেন মহাভারতেও এই নদী পূতঃসলিলা নদীরূপে বর্ণিত হয়েছে। প্রকৃতি ও প্রত্যয়গত অর্থে সরস্বতী হলো উদক। সরস + বতু স্ত্রীলিঙ্গে 'ঈ' যোগ করে সরস্বতী অর্থাৎ জলদায়িনী নদী। সরস্বতীর জলে স্নান করে আর্যঋষিরা পবিত্র হতেন এবং যাগযজ্ঞ করতেন। চাষবাসও হোত সরস্বতীর জলেই। পুণ্যতোয়া সরস্বতীর বর্ণনা তাই ছড়িয়ে আছে বেদের বিভিন্ন মণ্ডলে ও সূত্রে। ঋষি বশিষ্ঠ বলেছেন এই নদী গিরি থেকে সমুদ্র পর্যন্ত পথে গমন করেন— সেচ সমর্থ ও অভীষ্টবর্ষী।

সরস্বতী বন্দনা দিয়ে শুরু হয়েছে মহাভারত— 'দেবী সরস্বতীং দৈব ততোজয় মুদিরয়েৎ'। বৈদিক নদীরূপা সরস্বতী জ্যোতিরূপা হওয়ায় জ্ঞানের দেবতারূপে পুরাণ, তন্ত্র ও সাহিত্যে বিপুল ভক্তির অধিকারিণী। জলময়ী নদী সরস্বতী জ্ঞানের উদ্দীপনাকারিণী হওয়ার সুবাদে হয়েছেন বিদ্যার দেবী।

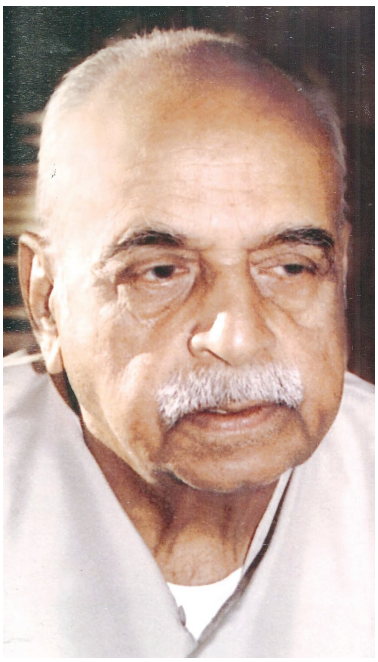

সরস্বতী গবেষণার প্রেরণাপুরুষ মোরপন্থ পিঙ্গলে।

সর্বজনবিদিত সত্য এই যে নৃপতিগণ সরস্বতী নদীতীরে দেবতার নিকট বলিদান করতেন। বহু মুনিঋষি এই নদীতীরেই তাঁদের আশ্রম তৈরি করে গুরুকুলে ছাত্রদের বিদ্যা বিতরণ করতেন। এই সব তথ্যের বিস্তারিত বিবরণ ভারতের বহু প্রাচীন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে।

মহাভারতের তথ্য অনুযায়ী সরস্বতী অববাহিকার উপরিভাগে ছিল যদুবংশীয়দের রাজত্ব। মহাভারতের যুগে সরস্বতী মর্যাদা সম্পন্ন নদীরূপে খ্যাতি অর্জন করেছিল। সরস্বতী বেদমাতা নামে সম্মানিত ছিলেন— 'বেদানাম মাতরম পুষ্য' (শান্তি পর্ব)। মহাভারতকার নদীটিকে সমুদ্রগামী সমগ্র নদীগুলির মধ্যে অগ্রগণ্য ও সর্বশ্রেষ্ঠরূপে বর্ণনা করেছেন। এই অঞ্চলকে মহাভারতে 'কুরুক্ষেত্র' নামে উল্লেখ করা হয়েছে। সরস্বতীর দক্ষিণে এবং দৃশদ্বতীর উত্তরে কুরুক্ষেত্র অবস্থিত ছিল।

পাণ্ডবেরা তাদের ১২ বৎসর বনবাসের সময় সরস্বতী নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে অতিবাহিত করেছেন। এই সময় অর্জুন হিমালয় গমন করেন এবং তাঁর যাত্রাপথে মহাস্রোতশালিনী সরস্বতী নদীকে অতিক্রম করতে হয়েছিল। সরস্বতী প্রসঙ্গে অর্জুন বলেছেন— 'নিষ্কলুষ নীলাভ জলরাশি সমন্বিত ভীতিউদ্রেককারী ঘূর্ণিস্রোত পরিপূর্ণ ও প্রবহমানা'। সরস্বতীর নিম্ন সমতলবর্তী অববাহিকায় ছিল দ্বৈত ও কাম্যকবন। এই কাম্যকবনেই ঋষি ধৌম্য আশ্রম রচনা করেছিলেন। অন্য ঋষিগণেরও এখানে আশ্রম ছিল। সে সময় এই স্থান জ্ঞান বিতরণের বড় কেন্দ্ররূপে চিহ্নিত ছিল। সমগ্র দেশ থেকে বিদ্যার্থীরা জ্ঞানার্জনের জন্য এখানে আসতেন।

বৈদিক সরস্বতী নদী একটি বিশাল নদী যা হিমালয় থেকে শুরু করে সিন্ধুসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এরূপ বিপুল জলপ্রবাহ সমন্বিত বিশাল নদী কীভাবে কালক্রমে আঁকাবাকা স্রোতে বহমান সর্পিল নদীতে পরিণত হয়ে শেষ পর্যন্ত বিনশনে পৌঁছে শুকিয়ে গেল তা ভাবলেও বিস্ময় জাগে। নানা ভৌগোলিক ও ভূতত্ত্ববিষয়ক বাধ্যবাধকতাই এর কারণ হিসাবে বিবেচিত হয়। বিখ্যাত ভূতত্ত্ববিদগণের নানা গবেষণায় সরস্বতী নদীর অন্তর্ধানের প্রধান কারণগুলো বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

(১) মহাভারতোত্তর যুগে উপনদী সমূহ থেকে বিচ্ছিন্ন সরস্বতী সরসুতি নাড়িতে পরিণত হয় এবং তার খাত প্রায় অবলুপ্ত হয়ে আসে। কারণ হিমালয়ের পাদদেশে বৃষ্টিপাত হ্রাস পাওয়ার দরুন জলের অপ্রাচুর্য।

(২) শতদ্রু ও যমুনা প্রাচীনযুগে সরস্বতীর উপনদী ছিল। শতদ্রু ধীরে ধীরে

পশ্চিমবাহিনী হয়ে শেষ পর্যন্ত সিন্ধুনদীতে মিশে গেছে। যমুনা পূর্বগামিনী হয়ে গঙ্গার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এই দুই নদীর থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াই সরস্বতী নদীর বিলুপ্তির মুখ্য কারণ।

(৩) হিমালয়ের পাদদেশে বারিপাতের অভাব সরস্বতীর অন্তর্ধানের অপর একটি কারণ। বর্তমান সময়ের ৩৫০০ বছর পূর্বে হিমালয়ের পাদদেশের বারিপাতের পরিমাণ এখনকার তুলনায় তিনগুণ ছিল। ৩০০০ বছর পূর্বে পুরাণোত্তর যুগে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমে যায়। পুরাণ পরবর্তী যুগে এই নদী ক্ষীণ হয়ে পড়ে এবং পরিণামে শুকিয়ে আসা নদীতটগুলি পরিত্যাগ করে জনবসতি সমূহ অন্যত্র চলে যায়। কালপ্রবাহে ধীরে ধীরে তাদের স্মৃতিপটে সরস্বতীর অবলুপ্তি ঘটে। স্বীকার করতেই হবে অসংখ্য ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও প্রতিষ্ঠানের সক্রিয় সহযোগিতা ও পরিচালনায় লুপ্ত সরস্বতী নদীর গতিপথ আবিষ্কারের প্রচেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু ওইসব গবেষণা ও অনুসন্ধান কাজের বহুবিধ সীমাবদ্ধতা ছিল। তথাপি ব্যক্তিগত স্তরে হওয়া সত্ত্বেও সেইসব অনুসন্ধানের ফলে বিভিন্ন গবেষণা ও প্রকাশনা আধুনিক সরস্বতী গবেষণা অভিযানকারীদের নিকট অতি মূল্যবান ও প্রয়োজনীয় সূত্রের সন্ধান জুগিয়েছে। ১৯৮৫ সালে 'ভারতীয় ইতিহাস সংকলন সমিতি' এবং প্রখ্যাত ঐতিহাসিক পদ্মশ্রী ড. হরিভাউ বাখনকরের নেতৃত্বে সরস্বতী গবেষণা অভিযান পরিচালিত হয়। নাগপুরের বাবাসাহেব আপ্তে স্মারক সমিতিও ওই অনুসন্ধান দলের সঙ্গে যুক্ত ছিল। বিদ্বান ঐতিহাসিক ও গবেষকের ওই দলটি ১৯ নভেম্বর ১৯৮৫ সিমলার নিকট আদি বদ্রীর শিবালিক পর্বত থেকে যাত্রা করে ৩৫০০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে গুজরাটের সোমনাথ পর্যন্ত সমীক্ষা চালান। ওই সমীক্ষক দলটি মাসাধিককাল অভিযান চালিয়ে লুপ্ত বৈদিক সরস্বতীর গতিপথ আবিষ্কার করেন। সিন্ধু ও হরপ্পা সভ্যতার যে সব উল্লেখযোগ্য স্থান আছে সেগুলি লুপ্ত সরস্বতীর উভয়তীরে অবস্থিত এক একটি উন্নত জনপদ। এই সমীক্ষার ফলে প্রাচীন সরস্বতী নদীর উৎস ও গতিপথের সঠিক অবস্থান নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে। সমীক্ষক দলের মতানুসারে এই নদীটি অন্তঃসলিলা অবস্থায় প্রবাহিত হচ্ছে। ইনসাট ১৪ উপগ্রহের সাহায্যে প্রাপ্ত ভূপৃষ্ঠের চিত্র থেকে সরস্বতী নদীর প্রবাহের খাত ধরা পড়েছে। সমীক্ষকদলের বিশেষজ্ঞ ভূতাত্ত্বিকগণ স্থানে স্থানে নদীখাতের জল পরীক্ষা করে সর্বত্র জলের উপাদান সুস্বাদু লক্ষ্য করেছেন। নদীখাত বরাবর বিদ্যমান লোকালয়, কৃষিজমি ও সবুজ বনানী। বস্তুত সরস্বতী নদীর প্রবাহ আবিষ্কারের অভিযান বিশেষ কয়েকটি ধাপকে সর্বসমক্ষে উপস্থাপিত করার উদ্দেশ্যে।

(১) অনুসন্ধানের একটি বিস্তারিত তথ্য প্রস্তুতকরণ।

(২) অনুসন্ধানে আবিষ্কৃত স্থানগুলির পুনরায় অভিযান করা যাতে ভবিষ্যতে এ সম্বন্ধে আরও গবেষণার পথ প্রশস্ত হয়।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রয়াত প্রবীণ প্রচারক মোরপন্থ পিঙ্গলের কাছ থেকে সরস্বতী সম্পর্কে এই ধরনের গবেষণার প্রেরণা, উৎসাহ ও পথনির্দেশ পাওয়া গেছে। শুধুমাত্র তাঁরই প্রচেষ্টায় হরিয়ানা, রাজস্থান ও গুজরাট গবেষণা সংস্থানের শাখা আরম্ভ করা গেছে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে এই বিশাল কর্মযজ্ঞে রাজ্য সরকারগুলির প্রশাসনিক যন্ত্র সম্পূর্ণ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র 'ইসরো' একাই হরিয়ানার আদি বদ্রী থেকে সরস্বতীর সবচেয়ে আধুনিক খাত ধরে কচ্ছের লবণাক্ত জলাভূমি পর্যন্ত প্রথম মানচিত্র প্রকাশ করে। আমেরিকার উপগ্রহ ল্যান্ডস্যাট থেকে পাওয়া ছবির সাহায্যে সরস্বতী নদীর শুকিয়ে যাওয়া ভূপৃষ্ঠের খাতগুলির বিশ্বাসযোগ্য নকশা প্রস্তুত করা গেছে। সরস্বতীর অববাহিকা কোনো স্থানে ৭ থেকে ৮ কিলোমিটার চওড়া এবং পাতিয়ালার সন্নিকটে ২০ কিলোমিটার পর্যন্ত চওড়া--- এমন তথ্য এখন দিবালোকের মতো স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল।

সরস্বতী নদীর গতিপথ আবিষ্কারের ফলে প্রযুক্তিগত ঐতিহ্যের দ্বারা সরস্বতী নদীর পুনর্জন্ম হিমালয় থেকে গুজরাট পর্যন্ত ২০ কোটি মানুষের জন্য জলসম্পদ উন্মুক্ত করা যাবে। মানব সভ্যতার ইতিহাসে এটি একটি যুগান্তকারী ঘটনা যে ১৬০০ কিলোমিটার দীর্ঘ নদীটিকে খুঁজে পাওয়া গেছে এবং নদীটি পুনরুজ্জীবিত হয়ে জলহীন মরুভূমিতে বর্ষব্যাপী হিমবাহ থেকে আসা জল দ্বারা সবুজায়ন করতে পারবে এবং 'ন্যাশনাল ওয়াটার গ্রিড' দ্বারা জলাভাবক্লিষ্ট অঞ্চলকে সুষম জল সরবরাহ করে বাঁচিয়ে তুলবে।

অন্তঃসলিলা সরস্বতীকে পূর্ণযৌবন দান করে আবার প্রবাহিত করা আজকের দিনে বাস্তব সত্য। ভগীরথের মহান প্রচেষ্টায় গঙ্গার মর্ত্যে আগমন। তাহলে তাঁর উত্তরাধিকারীরা কেন অন্তঃসলিলা সরস্বতীকে পুনরায় নতুন করে ভারতের বুকে নবজীবন দান করে বহমান করতে পারবে না? বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদরা মনে করেন না যে এটা কোনো অসম্ভব কাজ।

আমরা এই আশা ব্যক্ত করে বলতে চাই যে, আমাদের সমবেত প্রয়াসে সরস্বতী আবার ভারতের মৃত্তিকায় প্রবাহিত হবে। রাজস্থানের বিশাল মরু অঞ্চল-সহ সারা ভারতের মৃত্তিকা আবার হয়ে উঠবে সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা।

তথ্যসূত্র :

(১) লুপ্ত সরস্বতী নদী : সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত— শ্রী এল এস ওয়ালঙ্কার।

(২) সরস্বতী নদী (পুরাণ কথা আখ্যায়িকা ও বাস্তব)--- ড. এস কল্যাণরমণ।

(৩) সরস্বতী সারদার অনুধ্যান— এ কে বিশ্বাস।

জাতীয়তাবাদী বাংলা
সংবাদ সাপ্তাহিক
স্বস্তিকা
পড়ুন ও পড়ান
প্রতি কপি ১০ টাকা

চিঠিপত্র

মধ্যদিনের বর্ণবলয়

মহাজাগতিক কাণ্ড কতই না বর্ণবিচ্ছুরণ ঘটায়, তেমনই এক ঘটনা প্রত্যক্ষ হলো সম্প্রতি। বিজ্ঞানের ভাষায় নাম তার ২২° হ্যালো। প্রায় ২০,০০০ ফুট উচ্চতায় যখন তাপমাত্রা থাকে -- ৩০ থেকে -- ৩৫° সেন্ট্রিগ্রেড। তখন হাল্কা তুষার স্ফটিক তৈরি হয় যাদের ডায়ামিটার হয় ২০.৫ মাইক্রো-মিটারের কম। ফলে সূর্যের চারপাশে প্রিজমের মতো ষড়ভুজাকার যে স্ফটিক তৈরি হয় সেই অংশে দুবার ২২° ব্যবধানের প্রতিসরণের মাধ্যমে বর্ণবিচ্ছুরিত বলয় তৈরি হয়। রামধনুর বর্ণবিচ্ছুরণের থেকে এটি আলাদা। কারণ রামধনু সূর্যের বিপরীত দিকে জলবিন্দুর উপর প্রতিফলনের মাধ্যমে সৃষ্ট হয়। কিন্তু ২২° হ্যালো তুষার স্ফটিকে দুবার প্রতিসরণের মাধ্যমে কেবলমাত্র দ্বিপ্রহরে সৃষ্ট হয়। রামধনু মূলত আমরা অর্ধবৃত্তাকার দেখতে অভ্যস্ত কিন্তু ২২° হ্যালো সবসময়ই বৃত্তাকার। বৈজ্ঞানিকরা আরও সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা দিচ্ছেন। আবহাওয়ার উপর এর প্রভাব আমরা জানতে পারছি তার মাধ্যমে। যাই হোক ২৫ বৈশাখের আগে রবিপ্রণামের মতো রবিদ্যুতিতে মুগ্ধ হলো কলকাতা।

—সুদীপ্ত কর (শিক্ষক),
বারুইপুর, মাস্টারপাড়া,
কলকাতা-১৪৪।

রাজা গণেশ ও তাঁর পুত্র যদু

'রাজা গণেশের কূটনীতি' শীর্ষক রচনায় ('নবাঙ্কুর' বিভাগ, ১৫.২.১৬) সংকলক বিরাজ নারায়ণ রায় বলেছেন— জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শার্কির গৌড় অভিযানের সংবাদ পেয়ে মন্ত্রীসভার পরামর্শ মতো রাজা গণেশ আত্মগোপন করেন এবং তাঁর পুত্র যদু দরবেশ নেতা নুর-কুৎব-আলমের কাছে গিয়ে কলমা পড়ে মুসলমান হয়; তার মুসলমানি নাম হয় জালালউদ্দিন। সুলতান ইব্রাহিম গৌড় দখল করে জালালউদ্দিনকে গৌড়ের সিংহাসনে বসিয়ে জৌনপুরে ফিরে গেলে রাজা গণেশ গোপন আস্তানা থেকে বেরিয়ে এসে গৌড়ের শাসনক্ষমতা নিজের হাতে নিয়ে আবার সিংহাসনে বসেন এবং বিধি অনুযায়ী প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে যদুকে হিন্দুধর্মে ফিরিয়ে আনেন। কিন্তু, প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রামশচন্দ্র মজুমদারকৃত History of Mediaeval Bengal গ্রন্থসূত্রে আমরা যা জানি তা হলো : সুলতান ইব্রাহিমের সামরিক শক্তির মোকাবিলা করা রাজা গণেশের পক্ষে সম্ভব ছিল না; উপরন্তু তাঁর পুত্র যদু ('a clever politician') সুলতানের পক্ষে যোগ দেয়। ফলে, গৌড় দখল করতে সুলতান ইব্রাহিমের বেগ পেতে হয়নি। তিনি যদুকে ধর্মান্তরিত করে গৌড়ের সিংহাসনে বসিয়ে দিয়ে জৌনপুরে ফিরে যান। যদুর মুসলমানি নাম হয় জালালউদ্দিন মুহম্মদ শাহ। রাজা গণেশ সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। কিছুদিন পর তিনি জালালউদ্দিনকে সরিয়ে দনুজমর্দনদেব নাম নিয়ে গৌড়ের শাসনক্ষমতা আবার নিজের হাতে তুলে নেন। ১৪১১ খৃঃ নাগাদ তাঁর মৃত্যুর পর জালালউদ্দিন গৌড়ের শাসনক্ষমতা ফিরে পায়। কারও কারও মতে রাজা গণেশ পুত্র যদুকে (জালালউদ্দিন) তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে হিন্দুধর্মে পুনর্দীক্ষিত করে নজরবন্দি করে রেখেছিলেন; জালালউদ্দিন ষড়যন্ত্র করে রাজা গণেশের মৃত্যু ঘটিয়েছিল। তবে এ বিষয়ে স্পষ্ট তথ্য-প্রমাণ নেই।

দ্বিতীয় দফার রাজত্বকালে (খৃঃ ১৪১৮-৩৩) হানাফি মতবাদী জালালউদ্দিন মক্কায় একটি সুন্দর মাদ্রাসা গড়িয়ে দিয়েছিল; খলিফা এবং মিশরের রাজাকে উপঢৌকন পঠিয়েছিল। খলিফা তার আরজি মঞ্জুর করে মর্যাদাসূচক পোশাক পাঠিয়ে তাকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন ('...recognised him by sending him a robe of honour')। স্পষ্টতই, ধর্মান্তরিত যদু (জালালউদ্দিন) একজন ধর্মনিষ্ঠ মুসলমান ছিল। মৃত্যুর পর জালালউদ্দিনকে এক লাখি সমাধিমন্দিরে গোর দেওয়া হয়েছিল। তাঁর পুত্র সামসুদ্দিন আহমদ শাহ বছর তিন রাজত্ব করেছিল।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গজনির সুলতান মামুদ 'কতবার' নয়, একবারই (জানুয়ারি, ১০২৫) সোমনাথ আক্রমণ করেছিল।

—বিমলেন্দু ঘোষ,
কলকাতা-৬০।

প্রসঙ্গ বীর সাভারকর

বিপ্লবী-শ্রেষ্ঠ, হিন্দু হৃদয়-সম্রাট স্বাতন্ত্র্যবীর বিনায়ক দামোদর সাভারকর জন্ম ১৮৮৩ সালের ২৮ মে। বড় ভাই গণেশ ছিলেন একজন বিপ্লবী এবং ছোট ভাই নারায়ণ স্বদেশী মামলায় জেলে ছিলেন। গণেশের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

পুণার ফার্গুসন কলেজে পড়ার সময় বিনায়ক 'অভিনব ভারত' নামক এক বিপ্লবীদল গড়ে তোলেন। লোকমান্য তিলকের অধ্যক্ষতায় পুণায় এক বিশাল জনসভায় সাভারকর বিদেশি দ্রব্য বর্জনের ডাক দেন। তিনিই প্রথম ভারতীয় বিদেশি বস্ত্রের বহ্ন্যুৎসব করেন এবং সেই অভিযোগে তাঁকে কলেজ থেকে বহিষ্কৃত করা হয়।

বি.এ. পাশের পর ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য তিনি লন্ডনে যান এবং প্রবাসী ভারতীয়দের সংহত করেন। লন্ডনবাসী ছাত্রদের নিয়ে সংগঠন গড়ে তোলেন এবং ইউরোপীয় বিভিন্ন বৈপ্লবিক সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন; শেষে তিনি বোমা তৈরির ফরমুলা ভারতে পাঠান। সাভারকর ছিলেন জন্ম থেকে একজন স্বাধীনতাকামী বিপ্লবী সৈনিক।

লন্ডনে থাকাকালীন সাভারকর '১৮৫৭ সালে প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম' নামক পুস্তক রচনা করেন। আতঙ্কিত ইংরেজ ১৯১০ সালে ১৩ মার্চ লন্ডন স্টেশনে তাঁকে গ্রেপ্তার করে ভারতে পাঠায়। আসার পথে তিনি

জাহাজ থেকে সমুদ্রে লাফিয়ে পড়েন এবং রক্ষীদের গুলি বর্ষণ উপেক্ষা করে সাঁতার কেটে ফরাসী উপকূলে ওঠেন। তারিখটা ছিল ৮ জুলাই ১৯১০। পরে বৃটিশ পুলিশ তাকে ধরে নিয়ে যায় এবং বিচারের নামে প্রহসন চলার পর তাঁর দু'বার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। আন্দামানে নির্জন সেলে ইটের টুকরো আর কাঁটা দিয়ে তিনি দশ হাজার কবিতা রচনা করেন। দীর্ঘ ২৮ বছর পরে তিনি মুক্তি লাভ করেন।

হিন্দু সমাজের অনুন্নতদের সমমর্যাদা দানের আন্দোলন তাঁর অতুলনীয় কীর্তি।

গান্ধীজীর মুসলমান তোষণ নীতি ভারতকে সর্বনাশের পথে নিয়ে যাচ্ছে একথা তিনি বহুবার বহু জনসভায় বলেছেন। তাঁর নেতৃত্বে হিন্দু মহাসভা শক্তিশালী হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সাভারকর হিন্দু জাতিকে সামরিক শক্তিতে শক্তিশালী হওয়ার আহ্বান জানান। ১৯৬৬ সালে ১৬ ফেব্রুয়ারি সাভারকর ইহলোক ত্যাগ করেন।

হিন্দু জাতির প্রতি তাঁর শেষ বাণী—

* ভারত খণ্ডিত হয়েছে আমাদের অসতর্কতা এবং সাংগঠনিক দুর্বলতার ফলে কিন্তু আমরা আবার তাকে উদ্ধার করব।

* সেনাবাহিনী মাত্রই আক্রমণশীল হতে হবে; আত্মরক্ষার বাহিনী বলে কোনো বাহিনী নেই।

* কোদালকে আমি কোদাল বলেই ডাকি— এ কারণে আমাকে সাম্প্রদায়িক বলা হয়। আমি অখণ্ড ভারতে বিশ্বাসী, তাই আমি সাম্প্রদায়িক।

* আমার শবাধারে ফুল না দিয়ে একখানা খোলা তরবারি যেন রাখা হয়।

* একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষিত অপেক্ষা একজন সৈনিককে আমি পছন্দ করি।

—নীল কাশ্যপ,
১০২/২, কাশীনাথ চ্যাটার্জী লেন,
শিবপুর, হাওড়া।

আধা ভারতীয়

আলেকজান্ডারের সেনাপতি সেলুকস তার মেয়ে হেলেনকে চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে বিবাহ দেবার প্রস্তাব দেয়। চন্দ্রগুপ্ত তার প্রধান পরামর্শদাতা চাণক্যকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন। চাণক্য বলেন— বিবাহ করা যেতে পারে কিন্তু হেলেনের পুত্র কখনও সিংহাসনে অর্থাৎ রাজা হতে পারবে না। কারণ ওই পুত্রের শরীরে অর্ধেক রক্ত গ্রীস দেশের আর অর্ধেক রক্ত ভারতের হবে।

সোনিয়ার পুত্র রাহুলের শরীরে অর্ধেক রক্ত ইতালির আর অর্ধেক রক্ত ভারতীয়। মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে রাহুলকে ভারতবর্ষে প্রধান মন্ত্রী করার কথা কংগ্রেসের নেতারা বলছেন।

এই বিষয়ে দেশের মানুষকে চিন্তা ভাবনা করতে অনুরোধ করছি।

—বাদশা খান,
মাচানতলা, বাঁকুড়া।

ছন্নছাড়া হিন্দু জাতি

গণতন্ত্রের মাধ্যমে আমরা চলছি, করতালি দিয়ে নাচছি। সংসদভবন হৈহুল্লোড় করে কাঁপিয়ে তুলছি। ভালো কাজেরও বিরোধিতা করছি। সভা স্থগিত করে দিচ্ছি, দলত্যাগ করছি। ভারতে ধর্মনিরপেক্ষ সরকার অনুমোদন পেয়ে থাকে কংগ্রেস সরকারের আমল থেকেই। গণতন্ত্রের অধিকারে অফিস, কাছারি, আদালত, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতালে ছাত্রদল, আমলা, জামলা, কামলা সবাই গণতান্ত্রিকের মর্যাদায় চলছি বটে, কিন্তু অরাজকতা, ভণ্ডামি, দুর্নীতিতে ভরপুর। আলোচনা ও সমালোচনায় মুখর বুদ্ধিমান নাগরিকরা। দেশে গণতন্ত্রের কোনো পরিকাঠামো নেই। তার জন্য সরকারের নিকট আর্জি জানানোর একান্ত প্রয়োজন বলে মনে করি না। শুধু সমালোচনা করি। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারে সংখ্যাগরিষ্ঠ বিজেপি দল। নতুন করে সংবিধান প্রবর্তন করা এবং হিন্দুদের স্বার্থে সংবিধান সংশোধন করার জন্য সংসদে প্রস্তাব পাশ করা বিশেষ প্রয়োজন। ড. আম্বেদকর ১৯৫০ সালে ভারতের সংবিধানের মোয়া কংগ্রেস দলের হাতে তুলে দিয়েছেন। তখন পঁয়ত্রিশ কোটির মতো জনসংখ্যা ছিল। বর্তমান একশত ত্রিশ কোটি জনসংখ্যা হিসাবে শুধু এমএলএ এবং এমপি আসন সংখ্যা বাড়ছে।

শুধু আসন সংখ্যা বাড়ালেই চলবে না। সংবিধানের পরিবর্তন চাই। জাতিগত বিভাজনে ভরপুর বর্তমান সংবিধান। ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং গণতান্ত্রিক অধিকারে ভারতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ অবশ্যই শুরু হবে বলে অনুমান করা যাচ্ছে। ভারতে সংরক্ষণের নামে ধ্বংসলীলা অনুষ্ঠিত হবে। নেতা-মন্ত্রীরা কেউই রেহাই পাবেন না। কৈফিয়ত দিতে হবে বিশ্বপিতার আদালতে। এই কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের ভূমিকায় থাকবে সমস্ত স্তরের দুর্নীতিগ্রস্ত, এই যুগের মহামানব দলনেতারা। দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়বে ছন্নছাড়া হিন্দুজাতি। সুতরাং কেন্দ্রের সরকারকে শক্ত করে হিন্দু জাতি একতাবদ্ধ হলেই পরিত্রাণের আশা আছে বলে মনে করি। ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলেছেন— 'দুই নৌকায় পা দিবে না। জলে পড়ে তলিয়ে যাবে।' অগণিত রাজনৈতিকদল, গুণ্ডাদল, দালালদল ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য চুঙ্গা ফুকায় মাত্র। নেতা হতে মন্ত্রী পদলোভী; একাংশ অবুঝ লোভী ছন্নছাড়া স্বার্থান্বেষী নাগরিক নেতাদের পিছনে পিছনে ঘুরে বেড়ায় যদি কিছু পাওয়া যায়। হিন্দুস্থানে হিন্দু সংগঠন ভিন্ন সমস্ত রাজনীতি ফাত্রানীতির দলে পরিণত হতে চলেছে।

—চণ্ডীপ্রসাদ চক্রবর্তী,
নর্থ বঙ্গাইগাঁও, ওল্ড কলোনি, অসম।

'বিল্লদাকুঞ্জ'
কালিকাপুর, বোলপুর, জেলা : বীরভূম
ফোন : ০৩৪৬৩ ২৫২৪৪৭
মো : ৯৪৩৪৩০৬৭৯৬ / ৯২৩৩১৮৯১৭৯

বুদ্ধের জাতকের কাহিনিই 'ঈশফ্‌স্‌ ফেবল্‌স্‌' নামে ছড়িয়ে ছিল বিশ্বে

ড. তুষারকান্তি ঘোষ

ভারতবর্ষ অধ্যাত্মবাদের দেশ। মানুষের জীবনের ক্রমোত্তরণের মধ্য দিয়েই এর সাধনার প্রকাশ। এই যে মনুষ্যজীবন তার স্বরূপ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণেই নিবদ্ধ থাকে। ভারতবর্ষে সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকেই সান্ধ্যঅবসরে পরিবারের সকলকেই কত গল্প শোনাতেন বয়োবৃদ্ধেরা। এই গল্প, কাহিনি বা নীতিমূলক আখ্যানের মধ্যেই ছিল জন্ম জন্মান্তরের কত অভিজ্ঞতা— এই কথকের একটিই উদ্দেশ্য ছিল— জীবনের প্রতিটি ধাপ উত্তীর্ণ হতে হয় শুচিতা, পবিত্রতা ও মহৎকাজের দ্বারা।

এই অতীত কাহিনিগুলো পুষ্প-পত্রের পেলব স্পর্শ পেল ভগবান গৌতমবুদ্ধের জীবনের বর্ণিত আখ্যান কাব্যে। জাতক হলো গৌতম বুদ্ধের অতীত জন্ম বৃত্তান্ত। বৌদ্ধধর্মের সাধকেরা বলেন কোনো ব্যক্তি একটি জন্মের পুণ্যকর্মে বুদ্ধত্ব লাভ করতে পারেন না। তাঁকে জন্ম জন্মান্তরের অভিব্যক্তির মধ্য দিয়ে দানশীল আদি পারমিতার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে, নিজেকে উত্তরোত্তর চরিত্র উৎকর্ষের সাধনার মধ্য দিয়ে পূর্ণ প্রজ্ঞা লাভ করে অভিসম্বুদ্ধ হতে হয়। এই অভিসম্বুদ্ধ অবস্থায় তিনি স্বকীয় ও পরকীয় অতীত জন্মবৃত্তান্ত সবই সুস্পষ্ট রূপে দেখতে পান। ভগবান গৌতম বুদ্ধের এই অলৌকিক ক্ষমতা জন্মেছিল বলেই তিনি শিষ্যদের উপদেশ দেওয়ার সময় নিজের জন্মের অতীত কাহিনির বর্ণনা দান করে তাদের অনির্বাণ লাভের পথে এগিয়ে দিয়েছিলেন।

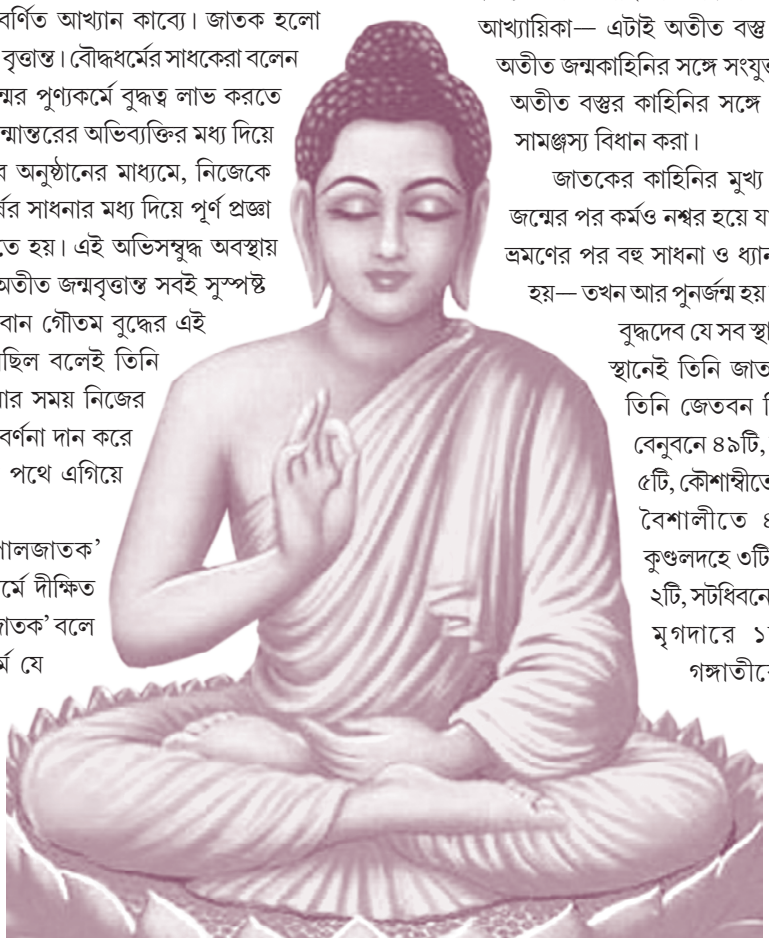

বুদ্ধদেব 'মহাধর্ম্মপালজাতক' বর্ণনা করে পিতাকে স্বধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন; 'চন্দ্রকিন্নরজাতক' বলে যশোধরার পাতিব্রাত্য ধর্ম যে পূর্ব সংস্কার থেকেই এসেছে তা তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন। তিনি শাক্য ও কোলিয়দের দ্বন্দ্ব মিটিয়েছিলেন যে পাঁচটি জাতকের কাহিনি বলে সেগুলো হলো সান্দন, দদ্দভ, লটুকিক, বৃক্ষধর্ম ও সম্মোদমান জাতকের কাহিনি।

গৌতম বুদ্ধ যে অনির্বাণ লাভ করেছিলেন তা তিনি ব্যক্তিগত মোক্ষের জন্য ব্যবহার করেননি, তিনি তা সমগ্র সমাজের জন্যই দান করেছিলেন— তাই তিনি বিশ্বের বুদ্ধ, ইতিহাসের বুদ্ধ। বুদ্ধদেবের দেহান্তের পর বৌদ্ধদের অন্যান্য শাস্ত্রের মতো জাতকের কাহিনিগুলোকে মানুষের কল্যাণের জন্য লিপিবদ্ধ করা হয়। জাতকের এই কাহিনিগুলো বৌদ্ধধর্ম শাস্ত্রের 'নবাঙ্গের' একটি অঙ্গ ও সুত্রপিটকের অন্তর্গত খুদ্দক নিকায়ের একটি শাখা। প্রত্যেক জাতকের তিনটি অংশ। প্রথম অঙ্কের নাম— বর্তমান কথা (প্রত্যুৎপন্ন বস্তু)। বুদ্ধদেব কী উদ্দেশ্যে এটা বলেছিলেন। দ্বিতীয় অংশের বস্তু হলো মূল আখ্যায়িকা— এটাই অতীত বস্তু যা বুদ্ধদেবের জীবনের অতীত জন্মকাহিনির সঙ্গে সংযুক্ত। তৃতীয় অংশ হলো— অতীত বস্তুর কাহিনির সঙ্গে বর্তমানের চরিত্রগুলোর সামঞ্জস্য বিধান করা।

জাতকের কাহিনির মুখ্য অভিব্যক্তি হলো— বহু জন্মের পর কর্মও নশ্বর হয়ে যায়— অর্থাৎ বহু 'সংসার' ভ্রমণের পর বহু সাধনা ও ধ্যানধারণার পর কর্মের লয় হয়— তখন আর পুনর্জন্ম হয় না— এরই নাম অনির্বাণ।

বুদ্ধদেব যে সব স্থানে গিয়েছিলেন সেই সব স্থানেই তিনি জাতকের কাহিনি বলেছেন। তিনি জেতবন বিহারে ৪১০টি জাতক, বেনুবনে ৪৯টি, শ্রাবস্তীতে ৬টি, রাজগৃহে ৫টি, কৌশাম্বীতে ৫টি, কপিলাবস্তুতে ৪টি, বৈশালীতে ৪টি, আলবীতে ৩টি, কুণ্ডলদহে ৩টি, কুশীনগরে ২টি, মগধে ২টি, সটধিবনে ১টি, দক্ষিণ গিরিতে ১টি, মৃগদারে ১টি, মিথিলাতে ১টি, গঙ্গাতীরে ১টি। মোট ৪৯৮টি জাতকের কাহিনি বুদ্ধদেবের মুখ হতে কথিত হয়েছিল।

মোট জাতকের কাহিনি কত সেই সংখ্যা সঠিক ভাবে নির্ণীত হয়নি। অধ্যাপক

হজসেনের বক্তব্য— তিব্বতদেশে ৫৬৫টি জাতক বিশিষ্ট একটি বৃহৎ জাতক মালা আছে। দক্ষিণ ভারতে বৌদ্ধশাস্ত্র উদীচ্যের মতে জাতকের সংখ্যা ৫৫০টি। নিদান কথাতে ৫৪৭টি জাতকের উল্লেখ আছে। এই জাতকের কাহিনিগুলোতে বোধিসত্ত্ব বিভিন্ন স্বরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। যেমন রাজা (৮৫টি জাতকে), ঋষি (৮৩), বৃক্ষদেবতা (৪৩), আচার্য (২৬), অমাত্য (২৪), ব্রাহ্মণ (২৪), রাজপুত্র (২৪), ভূম্যধিকারী (২৩), পণ্ডিত (২২), শুক্র (২০), বানর (১৮), শ্রেষ্ঠী (১৩), আঢ্যালোক (১২), মৃগ (১১), সিংহ (১০), রাজহংস (৮), বর্ত্তক (৬), হস্তী (৬), কুক্কুট (৫), দাস (৫), গৃধ্র (৫), অশ্ব (৪), গো (৪), ব্রহ্মা (৪), ময়ূর (৪), সর্প (৪), কুম্ভকার (৩), নিম্নশ্রেণীর লোক (৩), গর্দভ (৩), মৎস্য (২), মাহুত (২), মুষিক (২), শৃগাল (২), কাক (২), কাঠঠোকরা (২), চোর (২), শূকর (২), কুকুর, বিষবৈদ্য, ধূর্ত, বর্ধকী কর্মকার রূপে ১ টি করে— মোট ৫৩০টি জাতকে।

জাতকের এই কাহিনিগুলো অসাধারণ। একদিকে নীতিবোধের অপূর্ব শিক্ষা, অন্যদিকে চিত্তবৃত্তির উৎকর্ষ সাধনের দীক্ষা; একদিকে জন্মজন্মান্তরের অন্ধকার অতিক্রম করে আলোর পথে উত্তরণ, অন্যদিকে নিজ জীবনকে ক্ষুদ্র স্বার্থ চিন্তা থেকে মুক্ত করে মানব সমাজের তরে নিবেদন। এই কাহিনিগুলোর মানবিক ও সার্বজনীন আবেদন ছিল বলেই দিনান্তে পরিবার বর্গের সামনে তুলে ধরতেন বয়স্কেরা, যাঁরা প্রবীণ প্রজন্ম বণিক বৃত্তির যাত্রাপথে এই কাহিনিগুলোকে নিয়ে গিয়েছিলেন বিশ্বের দরবারে সমৃদ্ধ সম্পদের মতো। আর মুণ্ডিত কেশ ক্ষৌম বস্ত্র পরিধানকারী সন্ন্যাসী শ্রমণকুল এই সম্পদকে নিয়ে গিয়েছিলেন বিশ্বের প্রান্তরে প্রান্তরে পরিশীলিত রূপে। জাতকের কাহিনি এই ভাবেই ছড়িয়ে পড়েছিল বিশ্বের বহুদেশে।

জাতককে কেন্দ্র করে অজস্র কাহিনি বিভিন্ন স্থানে প্রচলিত ছিল। বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্বাণের পর প্রথম সপ্তপর্ণী গুহায় যে সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয় সেখানেই জাতক কাহিনিগুলোর সঙ্কলন সাধিত হয়েছিল। পরবর্তীতে ৩৭০ খৃঃ পূর্বাব্দে বৈশালীতে যে বৌদ্ধসঙ্গীতি হয়েছিল সেই স্থানেও পরিমার্জিত রূপে জাতকের কাহিনিগুলো সঙ্কলিত হয়েছিল।

জাতকের কাহিনির এই সঙ্কলন দেখা গেল প্রাচীন গ্রীসে— 'ঈশফ্‌স্ ফেবল্‌স্' নামে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 'ঈশফ্‌স্ ফেবল্‌স্'-এর ইংরাজি গ্রন্থ থেকে কিছু গল্প অনুবাদ করে বাংলায় প্রকাশ করলেন 'কথামালা'। গুজরাটি শিক্ষক নারায়ণ বালকৃষ্ণ গডপোল 'ঈশফ্‌স্ ফেবল্‌স্'-এর কাহিনি সংস্কৃতে অনুবাদ করেন। জে. গিলক্রীস্ট বেশ কিছুকাল পূর্বে ঈশফের কয়েকটি গল্প হিন্দী, পারসীক, বাংলা, সংস্কৃত ইত্যাদি ভাষায় অনুবাদ করে রোমান অক্ষরে মুদ্রিত করেন। 'ঈশফ্‌স্ ফেবল্‌স্' এখন প্রায় বিভিন্ন দেশের ভাষায় দেখা যায়।

কিন্তু পণ্ডিতেরা গবেষণা করে বলেছেন বর্তমান 'ঈশফ্‌স্ ফেবল্‌স্' ঈশফের লেখা নয়। ঈশফ নামে এক পণ্ডিতের জন্ম গ্রীসে হয়েছিল। তাঁর কথিত গল্পের কথা বিভিন্ন পণ্ডিতের উক্তিতে নিহিত আছে। যেমন গ্রীক দার্শনিক প্লেটো বলেছেন যে সক্রেটিসের মতো খ্যাতনামা পণ্ডিত কারারুদ্ধ অবস্থায় ঈশফের কয়েকটি গল্প অনুবাদ করে সময় অতিবাহিত করতেন। আরিস্টোকানিসও তাঁর রচনায় ঈশফের গল্পের চারবার উল্লেখ করেছেন। অ্যারিস্টোটল তাঁর অলঙ্কার শাস্ত্রের বিষয় আলোচনা করতে গিয়ে ঈশফের দুটি গল্পের উল্লেখ করেছেন— (১) মাঠে হরিণকে ঘাস খেতে দেখে ঘোড়া মানুষের সাহায্য চাইল। মানুষ ঘোড়ার মুখে লাগাম দিয়ে তার পিঠে চড়ে হরিণকে বধ করল। হরিণ মরল কিন্তু ঘোড়া মানুষের দাসে পরিণত হলো। (২) এক শিয়াল নদী পেরোবার সময় নর্দমায় পড়ে যায়। অজস্র জোঁক তার দেহের রক্ত চুষতে থাকে। এক সজারু তার সাহায্যে এলে শিয়াল তাকে জানায় যে এরা যা রক্ত শোষণ করার তা করে নিয়েছে, এদের ছাড়ালে অন্যদল আবার রক্ত শোষণ করতে শুরু করবে। লুসিয়ান আবার এই গল্পগুলো ভিন্ন স্থানে ব্যবহার করেছেন।

আসলে ঈশফের গল্প গ্রীকরা ভারতবর্ষ থেকেই গ্রহণ করেছিল। সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক দার্শনিক পিথাগোরাস খৃঃপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতে এসেছিলেন। তিনি ভারতবর্ষের পণ্ডিতদের কাছে দর্শনশাস্ত্র ও জ্যামিতি অধ্যয়ন করেছিলেন। তিনি ভারতবর্ষ থেকে অসংখ্য তথ্য, তত্ত্ব ও উপাখ্যান নিয়ে গিয়েছিলেন। পারস্যরাজ দারায়ুসের রাজসভাতেও বহু গ্রীক ও হিন্দু বিভিন্ন পদ অলঙ্কৃত করতেন। ফলে তাঁদের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান ছিল। দারায়ুসের পুত্র গ্রীসদেশ জয় করতে অভিযান করেন— এই অভিযানে তাঁর সঙ্গে বেতনভোগী ভারতীয় সৈনিকেরাও ছিল। দারায়ুসের পুত্র জারেক সেসের রাজসভায় ও তাঁর পুত্র আর্টাজারেক সেসের রাজসভায় অনেক গ্রীক পণ্ডিতেরা ছিলেন— এদের মধ্যে টিসিয়াস এক প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ছিলেন। ভারতবর্ষের অজস্র তথ্যসমৃদ্ধ এক গ্রন্থ তিনি রচনা করেন। ফলে গৌতমবুদ্ধের সময়ে গ্রীকরা ভারতবর্ষ হতে জ্ঞান, বিজ্ঞান, ধর্মচর্চার অসংখ্য উপাদান পেয়েছিল। এই সূত্র ধরেই জাতক কাহিনির প্রবেশ ঘটেছিল গ্রীসে। ডিমক্রিটাস ও প্লেটো যে কাহিনিগুলোর উল্লেখ করেছিলেন তা লোকমুখেই চলে গিয়েছিল গ্রীসে যার ঋণ তারা অস্বীকার করেননি।

৩২৬ খৃ.পূর্বাব্দে আলেকজান্ডার ভারত আক্রমণের সূচনা করে। আলেকজান্ডারের নৃশংস আক্রমণ একদিকে যেমন ভারতবর্ষের নগরগুলোর উপর অভিশাপ রূপে দেখা দিয়েছিল, অন্যদিকে গ্রীক ও হিন্দুদের প্রত্যক্ষ পরিচয়ও ঘটেছিল এই আক্রমণের মাধ্যমে। এই অভিযানের কালখণ্ডেও বৌদ্ধধর্মের শ্রমণ ও প্রচারকেরা মধ্য এশিয়া, গ্রীস, দক্ষিণপূর্ব এশিয়া, চীন, জাপান এমনকী ইউরোপের ভূ-খণ্ডে তথাগতের অমৃতময় বাণীর প্রচার করতে যেতেন। যীশুখৃষ্টের জন্মের কিছুকাল পূর্বে সৌরাষ্ট্রের ভৃগুকচ্ছের এক বৌদ্ধশ্রমণ আগাস্টাস সীজারের রাজত্বকালে এথেন্স নগরে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করতে গিয়েছিলেন।

আলেকজান্ডার যখন ভারতবর্ষ হতে গ্রীসে প্রত্যাবর্তন করে তখনও তার বহু অনুগামী ভারতবর্ষ হতে বহু পুঁথি ও গ্রন্থ নিয়ে যায়। গ্রীকদের সবচাইতে প্রাচীন কথা সংগ্রহ আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পরেই সম্পাদিত হয়--- সময়টা ৩০০ খৃ.পূর্বাব্দ। আলেকজান্দ্রিয়া নগরের বিখ্যাত গ্রন্থাগারের

প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ডেমিট্রেয়াস ও ফেলিরিয়স। তাঁরাই ছিলেন সেই কথা সংগ্রহের উদ্যোক্তা। তাঁরা প্রায় দুইশত কথা সংগ্রহ করেছিলেন এবং এই কথা সংগ্রহকে 'ঈশফের কথা' নাম দিয়ে প্রচার করেছিলেন। এই কথাকে গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষার প্রসিদ্ধ কবি ফ্রিডাস খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন। তাঁর অনুবাদই বিভিন্ন ভাষায় 'ঈশফের কথা' বলে প্রচলিত আছে।

ইউরোপে 'ঈশফ্স্ ফেবল্স্' কীভাবে এল এই বিষয়ে গবেষণা করেন ইংল্যান্ডের বিশিষ্ট অধ্যাপক রীজ ডেভিস। তিনি জানাচ্ছেন যে খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমে কনস্টান্টিনোপল শহরে প্লানডিজ নামে এক যশস্বী পণ্ডিত ও যাজক কিছু কিছু কথা সংগ্রহ করে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। প্লানডি ঈশফের নামকে চিরস্মরণীয় করার জন্য এই গ্রন্থের নাম তিনি 'ঈশফ্স্ ফেবল্স্' রাখেন। খৃষ্টীয় পঞ্চতম শতাব্দীর শেষে ইতালির মিলান শহর থেকে ওই গ্রন্থের প্রথম মুদ্রণ হয়। এরপর থেকেই প্লানডিজের গ্রন্থ ইউরোপের বিভিন্ন ভাষায় মুদ্রিত হতে থাকে।

খৃ.পূর্ব প্রথম শতাব্দীতে বাব্রিয়াস নামে এক গ্রীক কবি পদ্যের মাধ্যমে যে গল্প কথাগুলো রচনা করেছিলেন, প্লানডিজ তাঁর গ্রন্থ রচনার সময় বাব্রিয়াসের রচনা থেকেই সেই সব উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন। ল্যাটিন কবি ফ্রিডাসের গ্রন্থ হতেও প্লানডিজ বহু গল্প সংগ্রহ করেছিলেন। ইউরোপের পণ্ডিতদের মতে ফ্রিডাস, বাব্রিয়াসের মতো প্লানডিজও এইসব গল্প ভারতবর্ষ হতে সংগ্রহ করেছিলেন।

'ঈশফের গল্পের' মধ্যে অধিকাংশ গল্পই পালি ভাষায় লিখিত জাতকের গ্রন্থ হতে নেওয়া। কিছু কিছু গল্প 'পঞ্চতন্ত্র' হতে 'ঈশফ্স্ ফেবল্স্' প্রবেশ করেছিল। 'পঞ্চতন্ত্র' প্রথমে ১৩টি তন্ত্রে বিভক্ত ছিল। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে পাঁচটি তন্ত্র আলাদা করে নিয়ে 'পঞ্চতন্ত্র' রচিত হয়েছিল। ৫৩১-৫৭৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই খোসরু নুসিবনের চিকিৎসক বর্জুয়ে পঞ্চতন্ত্রের কাহিনি পহ্লবী ভাষায় (প্রাচীন পারসিক ভাষা) অনুবাদ করেছিলেন। ৭৫০ খৃষ্টাব্দে ওই গ্রন্থ সিরিয়াক ভাষায় অনুবাদিত হয়ে ওর নাম হলো 'কলিলগ' ও 'দমনগ'। আমাদের পঞ্চতন্ত্রে 'কর্কটক ও দমনক' নামে দুটো শিয়ালের বিভিন্ন উপাখ্যান দিয়ে 'পঞ্চতন্ত্র' লিখিত হয়েছিল। সিরিয়াক ভাষায় অনুবাদ হয়ে সেটি 'কলিলগ' ও 'দমনগ'-এ রূপান্তরিত হলো। পরে সেই গ্রন্থই আরবিক ভাষায় অনুবাদিত হয়ে নাম হলো— 'কলিলঃ ও ডিমনঃ ।

সিরিয়ন সেখ নামে এক ইহুদি ১০৮০ খৃষ্টাব্দে 'কলিলঃ ও ডিমনঃ' গ্রন্থটিকে গ্রীক ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। ১২৫০ খৃষ্টাব্দে দেখা গেল একজন ইহুদি সেটি হিব্রু ভাষায় অনুবাদ করে দিয়েছেন। এই হিব্রু গ্রন্থটি ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদিত হয়ে গেল ১২৬৩-১২৭৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। এই অনুবাদ করলেন জন অব কেপুয়া। এই আরবিক গ্রন্থটি স্প্যানিশ ও ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদিত হয়। এই দ্বিতীয়বার পঞ্চতন্ত্রের ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদিত গ্রন্থের নাম হলো 'AESVP the Old'। এই গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিত আছে আলেকজান্ডারের সাম্রাজ্যের প্রতিনিধি Dabschclim-কে ভারতের নীতিশিক্ষা দেওয়ার জন্য বিদপই নামে এক ভারতীয় পণ্ডিতকে নিযুক্ত করা হয়েছিল। বিদপই তাঁকে নীতিশিক্ষার জন্য 'পঞ্চতন্ত্র' রচনা করে দিয়েছিলেন।

কতদিন পার হয়ে গেছে এইসব ইতিহাসের কাহিনির। আজও মুনি জাতকের কাহিনি ঈশফের গ্রন্থে ষণ্ড ও গোবদস, নৃত্যজাতক— কিকি ও ময়ূর, মশক জাতক— খল্লাট ও মক্ষিকা, সুবর্ণ হংস জাতক— স্বর্ণডিম্ব প্রস্রবিনী হংসী, সিংহ চর্মজাতক--- সিংহচর্মাচ্ছাদিত গদর্ভ, কচ্ছপ জাতক— কচ্ছপ ও ঈগলপক্ষী, জম্বুজাতক— কাক ও শৃগাল, জবশকুন জাতক— নেকড়ে বাঘ ও বক, চুল্ল ধনুগ্রাহক জাতক—কুকুর ও প্রতিবিম্ব, কুক্কুট জাতক— শৃগাল, মোরগ ও কুকুর, দ্বীপিজাতক— নেকড়ে বাঘ ও মেষশাবক— এইরূপ অসংখ্য কাহিনি তথাগতের অমৃতময় উপদেশের বাণী বহন করে নিয়ে চলেছে সারা বিশ্বে।

সারাদিনের কর্মকোলাহলের পর তথাগত বুদ্ধ সন্ধ্যার স্তিমিত প্রদীপালোকে জাতকের কাহিনি বলতেন বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সামনে। ঊর্ধ্বাকাশে পুঞ্জীভূত নক্ষত্ররাশি। চারিপাশে অরণ্যের নিস্তব্ধ পরিবেশ। তথাগত বলে চলতেন— সারথি যেমন অশ্বকে দমন করে, সেই ভাবে যিনি ইন্দ্রিয়কে শান্ত করেছেন, যিনি নিরভিমান, কলুষহীন, দেবতারাও তাঁকে ঈর্ষা করেন। যিনি সম্যক রূপে ব্রতধারী, যিনি শত্রু- মিত্রের কাছে সমভাবাপন্ন, অনুরাগ-বিরাগ শূন্য তিনি পঙ্কহীন হ্রদের মতো নির্মল ও শান্ত। তাঁর সংসার বা যাওয়া-আসা নেই। মানুষের মানসিক এই অবস্থার নামই নির্বাণ। এই অনুভূতিতে কোনো আনন্দ বা নিরানন্দ নেই।

যিনি শূন্যাগারে প্রবেশ করেছেন বা অসক্তিশূন্য হয়েছেন, যিনি শান্ত চিত্ত ও ধর্মের প্রকৃত রূপ দেখতে পেয়েছেন সেই ভিক্ষু অমানুসীরতি বা দিব্য আনন্দ লাভ করে থাকেন।

তথাগতের বাণী সেদিন কোটি কোটি হৃদয়কে প্রদীপ্ত করেছিল। তিনি একটি জন্মের মধ্য দিয়ে বুদ্ধত্ব লাভ করেননি। বহু জন্মের মালায় গাঁথা ছিল তাঁর অনন্ত জীবনপ্রবাহ। একটি জন্মে হয়তো অবিদ্যার ক্ষয় সাধন বা মায়া আবরণের অবসান ঘটানো সম্ভব নয়। পূর্ণের সঙ্গে মিলনের জন্য যুগযুগ ধরে, জন্ম জন্মান্তরের মধ্য দিয়ে যেতে হবে সেই অনির্বাণ লাভের পথে— তথাগত বুদ্ধের জীবনে সেই পথ পরিক্রমার কাহিনির নামই জাতক।

এই কাহিনিকে যাঁরা বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে দিয়েছেন তাঁরা সকলেই তথাগতের মরমিয়া বাণীর শ্রোতা। সেখানেই তাঁদের জীবনের সার্থকতা আর আমরা করুণাময় বুদ্ধের সেই বাণী বহনের উত্তরসূরি। তাই অনির্বাণের পথে যাত্রা আমাদের— পাথেয় সম্বল বুদ্ধের জাতক কাহিনি।

(বুদ্ধপূর্ণিমা উপলক্ষে প্রকাশিত)

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের
মুখপত্র
প্রণব
পড়ুন ও পড়ান

প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার

রেবেকা মিত্র

প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রথম মহিলা শহিদ। একুশ বছরের এক তরুণী। মৃত্যুর আগের দিন তাঁর মাকে তিনি চিঠি লিখেছিলেন, একটিবার তোমাকে দেখে যেতে পারলাম না। সেজন্য আমার হৃদয়কে তুমি ভুল বুঝো না। ...আমি যে সত্যের জন্য, স্বাধীনতার জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতে এসেছি— তুমি কি তাতে আনন্দ পাও না?

মাস্টারদা সূর্য সেনের নির্দেশে ১৯৩২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর প্রীতিলতার নেতৃত্বে আটজন বিপ্লবী আক্রমণ করতে চলেছেন চট্টগ্রামের পাহাড়তলীর ইউরোপীয়ান ক্লাব। বোমা ও গুলি নিয়ে তিন দিক থেকে বিপ্লবীরা আক্রমণ করলেন। ক্লাবে তখন একদল বিদেশি উদ্দাম নৃত্যগীতে উন্মত্ত। বিপ্লবীদের গুলিতে ক্লাবের একজন নিহত ও কয়েকজন আহত হয়। আটজন বিপ্লবী অক্ষত দেহে পালাতে সক্ষম হলেও প্রীতিলতা আর ফিরলেন না। তিনি শহিদ হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন পটাশিয়াম সায়নাইড। কাজ শেষ করে তিনি বিষপান করে মাতৃভূমির মুক্তিযজ্ঞে উৎসর্গ করলেন নিজেকে। পুলিশের হেফাজতে অন্তিম সৎকার হয়েছিল ভারত মায়ের এই দরদি সন্তানের। ভারতের প্রথম মহিলা শহিদকে শেষ সম্মান জানাতে সেদিন কেউ ছিল না।

চট্টগ্রাম শহরে ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ১৩ মে জগবন্ধু ও প্রতিভাময়ী ওয়াদ্দেদারের ঘরে জন্ম হয় দৃঢ়চেতা প্রীতিলতার। চট্টগ্রামে তখনও মেয়েদের লেখাপড়ার চল তত ছিল না। কিন্তু প্রীতিলতার পড়াশোনার প্রতি প্রচণ্ড আগ্রহ ছিল শিশুকাল থেকে। দাদাকে যখন

মাস্টারমশাই পড়াতে আসতেন, তিনি বই হাতে পড়ার ঘরের পেছনে লুকিয়ে থাকতেন। দাদার পড়া শেষ হলেই তিনি এসে বসতেন মাস্টারমশাইয়ের সামনে। তিনিও প্রীতিলতার আগ্রহ দেখে তাঁকে পড়াতেন। মা প্রতিভাময়ীরও যথেষ্ট আগ্রহ ছিল মেয়ের পড়াশোনার ব্যাপারে। অবশেষে সাত বছর বয়সে মেয়েকে তিনি স্কুলে ভর্তি করে দেন।

চট্টগ্রাম থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে ঢাকায় আসেন ইন্টারমিডিয়েট পড়তে। এই সময় লীলা নাগের দীপালী সঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯৩০ সালে ঢাকা বোর্ড থেকে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে আই.এ. পাশ করেন। কলকাতার বেথুন কলেজে ভর্তি হন ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে বি.এ. পড়তে।

কলকাতায় পড়ার সময়ে একবার চট্টগ্রাম শহরে গেলে তাঁর পরিচয় হয় 'যুগান্তর' দলের বিপ্লবী নির্মল সেনের সঙ্গে। তাঁর কাছে প্রীতিলতা শেখেন বক্সিং, রাইফেল ও রিভলবার চালনা। এইখানে তিনি দলের নেতা মাস্টারদা সূর্য সেনের সঙ্গে পরিচিত হন। মাস্টারদার নেতৃত্বে তখন চট্টগ্রামে একের পর এক বিপ্লবী কর্মকাণ্ড ঘটে চলেছে— অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, জালালাবাদ পাহাড়ে ইংরেজদের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধ প্রভৃতি। যুগান্তর দলের কর্মী হয়ে কলকাতা ও চট্টগ্রামের মধ্যে সংযোগ রক্ষা ও গোপন খবর আদান-প্রদানের দায়িত্ব পান প্রীতিলতা। কারাবন্দীদের সঙ্গেও যোগাযোগ করতেন।

প্রায় তিন মাস তিনি মাস্টারদার সঙ্গে কুমিল্লা, চাঁদপুর ও চট্টগ্রামের গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ান। যেখানেই তাঁরা গেছেন, বিপ্লব ছড়িয়ে পড়েছে। ঘন ঘন ওই সব জায়গায় বিপ্লবের খবরে পুলিশ তোলপাড় করেছে সেখানে। সূর্য সেনের টিকি ছুঁতে না পেরে নৃশংস অত্যাচার করেছে গ্রামবাসীদের ওপর। একটা গ্রাম জ্বালিয়েও দিয়েছিল। ইংরেজ সরকার সূর্য সেনের মাথার দাম ঘোষণা করেছিল দশ হাজার টাকা এবং প্রীতিলতার জন্য পাঁচশো টাকা। অবশেষে মরিয়া হয়ে প্রীতিলতা বিশেষ কোনো বৈপ্লবিক কাজ করার আদেশ চাইলেন মাস্টারদার কাছে। এরপরই মাস্টারদার নির্দেশে পাহাড়তলির ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ এবং ভারতের প্রথম মহিলা শহিদ হওয়ার গৌরব অর্জন করেন প্রীতিলতা।

মায়ের কাছে লেখা শেষ চিঠিতে প্রীতিলতার জিজ্ঞাসা, ''দেশবাসী যে বিদেশি অত্যাচারে জর্জরিত, দেশমাতৃকা যে শৃঙ্খলভাবে অবনতা, লাঞ্ছিতা, উৎপীড়িতা তুমি কি সবই নীরবে সহ্য করবে মা? একটি সন্তানকে কি তুমি মুক্তির জন্য উৎসর্গ করতে পারবে না?'' —হ্যাঁ, মায়ের শ্রেষ্ঠ সন্তান প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার বাঙালি নারীর সংগ্রামী মনোবল বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়ে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন ভারত মায়ের চরণে।

(অগ্নিযুগের বঙ্গললনা থেকে, সংক্ষেপিত)

মনীষী কথা

দাদাঠাকুর শরৎচন্দ্র পণ্ডিত

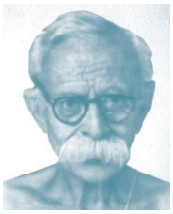

শরৎচন্দ্র পণ্ডিত ২৭ এপ্রিল ১৮৮১ সালে বীরভূমের সিমলাদ্দি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বড় হওয়া কর্মক্ষেত্রে সবই মুর্শিদাবাদ জেলায় জঙ্গীপুরকে কেন্দ্র করে ছিল। তিনি ছিলেন লেখক, প্রকাশক, সমালোচক। কিন্তু সারা দেশে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল হাস্যরসের জন্য। তাঁর হাসির ছড়া শুনে হেসে লুটিয়ে পড়েনি সে যুগে এমন মানুষ ছিল বিরল। লোকে ভালোবেসে তাঁকে দাদাঠাকুর বলে ডাকত। ধীরে ধীরে এই নামেই তিনি পরিচিতি লাভ করেন। দাদাঠাকুরের স্মৃতিশক্তি ছিল অসাধারণ। সমসাময়িক ঘটনা নিয়ে তিনি মুখে মুখে হাসি আর মজার ছড়া বানিয়ে দিতে পারতেন। তাঁর প্রকাশিত পত্রিকাটিও ছিল হাসি মজা আর ব্যঙ্গের জীবন্ত প্রমাণ। দেশের বা সমাজের যারা শত্রু তাদের কাউকে তিনি ছাড়েননি। তখনকার ইংরেজ সরকারের কর্তাব্যক্তিরাও তাঁকে তাঁর কৃতিত্বের জন্য পুরস্কার দিয়েছেন ও সম্মান জানিয়েছেন। তাঁর পত্রিকার নাম ছিল বিদূষক। লেখক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামকরণ করেছিলেন। ১৯৬৮ সালের ২৭ এপ্রিল অর্থাৎ জন্মদিনেই জঙ্গীপুরে দাদাঠাকুরের মৃত্যু হয়। ১৯৬২ সালে তাঁকে নিয়ে সিনেমা হয়। দাদাঠাকুরের ভূমিকায় ছবি বিশ্বাস অভিনয় করেন।

জানো কি?

গীতায় ৭০০টি শ্লোক আছে—

- শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত —৫৭৪টি।
- অর্জুনের মুখনিঃসৃত —৮৫টি।
- সঞ্জয়ের মুখনিঃসৃত —৪০টি।
- ধৃতরাষ্ট্রের মুখনিঃসৃত —০১টি।

ছবিতে অমিল খোঁজ

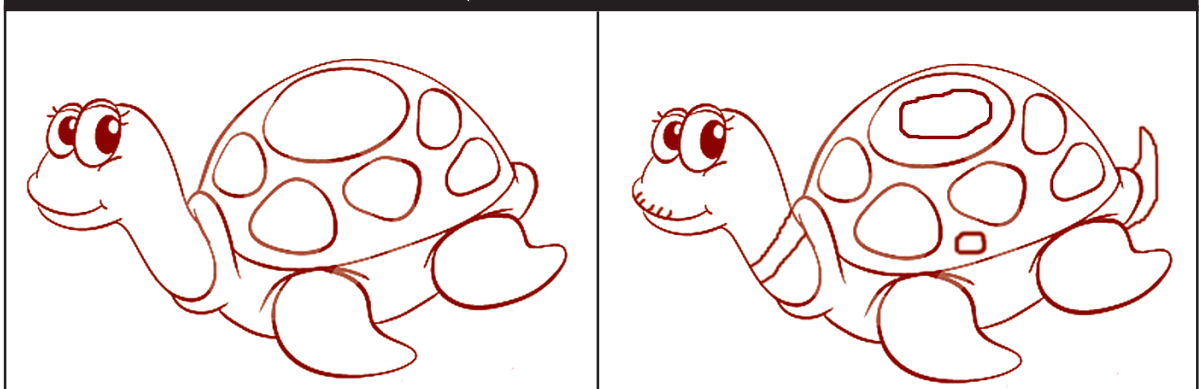

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে	*সঠিক ভাবে সাজাতে হবে*
(১) ল গ্ধ ব ধ	(১) সা সৈ গ ত র ক
(২) চি ং টি জ	(২) তু ধ ষা ব র ল

২ মে সংখ্যার সংখ্যার উত্তর

(১) অজাতশত্রু (২) স্বভাবজাত

২ মে সংখ্যার সংখ্যার উত্তর

(১) কলাকুঞ্জ (২) চিত্রাঙ্গদা

উত্তরদাতার নাম

(১) যাদব দাস, বরাবাজার, পুরুলিয়া (২) শ্রেয়সী ঘোষ, অমৃতি, মালদা
(৩) অয়ন সাঁতরা, টি. পি. রোড, কলকাতা-৬ (৪) রাজদীপ পাল, টি. পি. রোড, কলকাতা-৬

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
E-mail : swastika5915@gmail.com
ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

সৃষ্টিশীলা নারী

মালবিকা দাসপ্রামাণিক

বিশ্বচরাচরের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, আবশ্যিক এবং মূল্যবান দিক হলো সৃষ্টি। আর সেই জন্যই পার্থিব সব বস্তুর অস্তিত্বের মূল সত্যটিই অন্তর্নিহিত রয়েছে সৃষ্টির মধ্যে। প্রকৃতি ও পুরুষের সম্মিলিত প্রয়াসে এই জীবজগৎ। কী উদ্ভিদ, কী জীবজন্তু সকলেই নিজেদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে মেতে ওঠে সৃষ্টির খেলায়। মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে নিজ সৃষ্টির মাধ্যমে প্রকৃতিকে সাজিয়ে তুলতে অবিরাম প্রয়াস করে চলেছে। আর এই সৃষ্টির মূলে নারীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই নারীকে পূজা করে একটা জাতি সমৃদ্ধ হয়।

কথিত আছে নারীই হলো সৃষ্টি রূপিণী শক্তি। কারণ সকল সফল ব্যক্তিরই অভিমত তাদের সফলতার পেছনে থাকে নারীর প্রেরণা। এই নারী কখনও মাতৃরূপে, কখনও পত্নীরূপে আবার কখনও কন্যারূপে অনুপ্রাণিত করে স্রষ্টাকে।

সৃষ্টির বিভিন্ন দিক রয়েছে যার মধ্যে তার একটি অন্যতম হলো 'সাহিত্য'। সাহিত্যিকের সৃষ্টিতে অবগাহন করে পাঠক লাভ করে অমৃতসম তৃপ্তি। সে পায় গভীর সত্যের সন্ধান, লাভ করে সমাজজীবনের অভিজ্ঞতা।

সাহিত্যিকদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামটিই সবার আগে উঠে আসে, যাঁর সৃষ্টি সম্ভার অধিকৃত করে আছে শুধু বাংলার নয় সমগ্র বিশ্ববাসীর মন। তাঁর লেখনীর মাধ্যমে সৃষ্টির বিচিত্র রূপের যে প্রকাশ ঘটেছে তা মুগ্ধ করে সকলকে।

রবীন্দ্রনাথের এমনসব অকৃত্রিম সৃষ্টির পেছনে যাঁরা প্রেরণা জুগিয়েছেন অবশ্যই তাঁরা নারী। তাঁর সাহিত্য জীবনের প্রথম দিকে রচিত কবিতাগুলি তিনি প্রথমেই তাঁর নতুন বৌঠানকে শোনাতেন এবং তিনিও কবিকে অনুপ্রাণিত করে তাঁর সৃষ্টির বেগকে উৎসাহিত করতেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সৃষ্টির পেছনে ক্রিয়াশীল 'জীবনদেবতা'র অস্তিত্বকে অনুভব করতেন, আর এই 'জীবনদেবতা' ছিল হয়তো কোনো এক নারীশক্তি—

''অন্তরমাঝে... ... একাকী
তুমি অন্তর ব্যাপিনী।''

এই লেখা যে নারীর উদ্দেশেই তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এছাড়া তাঁর কবিতাগুলিও স্ত্রীবাচক। যেমন 'চিত্রা', 'চৈতালী', 'পূরবী' ইত্যাদি। 'রক্তকরবী'-র 'নন্দিনী' চরিত্রটিও যেন উজ্জ্বল প্রাণময় সৃষ্টিরূপিণী এক নারীশক্তির প্রকাশ। নারী যেমন একদিকে সৃষ্টির শক্তি অন্যদিকে নারীশক্তিই ডেকে আনে ধ্বংস। 'চোখের বালি', 'মালঞ্চ' ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ সেই দিকগুলিই তুলে ধরেছেন।

রবীন্দ্রনাথের নতুন বৌঠানের সঙ্গে সঙ্গে ভাইঝি ইন্দিরা দেবীও তাঁর সৃজনশীল মনকে প্রস্ফুটিত হতে সাহায্য করেছে। তার পরিচয় পাওয়া যায় ইন্দিরা দেবীকে লেখা একটি চিঠিতে —'তোকে আমি ... ... আমার মনের সমস্ত বিচিত্র ভাব যেরকম ব্যক্ত হয়েছে এমন আমার আর কোনো লেখায় হয়নি।''

সাহিত্য জগতে মাইকেল মধুসূদন দত্তও একজন উজ্জ্বল প্রতিভা। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন খুব একটা সুখের ছিল না। তিনি ইংরেজ কন্যা রেবেকা অক্টাভিসকে বিয়ে করেন এবং কয়েক বছরের মধ্যেই তাঁর বিবাহ বিচ্ছেদ হয়। তাঁর এইরকম জটিল মানসিক অবস্থার বহিঃপ্রকাশ ঘটতে দেখা যায় 'আত্মবিলাপ' কবিতাটির মধ্যে। এরপর তিনি দ্বিতীয় বিয়ে করেন ফরাসী মহিলা আঁরিয়েত্তাকে। তিনি একজন পতিনিষ্ঠা বাঙালি নারীর মতোই ছিলেন।

মধুসূদন নারীকে একদিকে পতিপরায়ণা রূপে এবং অন্যদিকে তেজস্বিনী, বিদ্রোহিনী রূপে দেখতে পছন্দ করতেন। বীরাঙ্গনা, ব্রজাঙ্গনা ইত্যাদি কাব্যগুলি তাঁর সেই মানসিকতারই পরিচয় বহন করে বলে মনে করা যায়।

তাই 'মেঘনাদ বধ' কাব্যে মেঘনাদের স্ত্রীর বয়ানে তিনি ঘোষণা করেছেন—

''দানব নন্দিনী আমি; রক্ষঃ কুল—বধূ,
রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী,—
আমি কি ডরাই, সখী, ভিখারী রাঘবে?''

নারীকে এমনতর রূপে প্রকাশ ঘটানোর প্রেরণা হয়তো বা তিনি তাঁর দ্বিতীয়া পত্নীর কাছেই পেয়েছিলেন। অর্থাৎ নারী সৃষ্টিরূপিণী এমনই এক শক্তি যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ রূপে তাঁর সৃষ্টিক্রিয়া চালিত করেন। কখনও সচেতন ভাবে আবার কখনও অসচেতন ভাবে। নারী না থাকলে সৃষ্টির সমস্ত পথ হয়ে যেত রুদ্ধ, সমাজ সংসার হোত অচল। নারীর হাতেই সমাজ, সংসারের সৃষ্টি, বিকাশ ও ধ্বংসের চাবিকাঠি।

কবির কথায়—

''... ... অন্ধকারে
দাঁড়ায়ে রমণী
কি ধন তুমি করিছ দান
না জান আপনি।''

কবি মোহিতলাল মজুমদার তাঁর 'নারীস্তোত্র' কবিতায় নারীর মহিমাকীর্তন করেছেন এভাবে— 'তোমারি মাঝারে হেরি' নিখিলের প্রাণপ্রবাহিণী।' ▮

এনডিএ-কে দেশের যুবসমাজের জন্য চাকরি তৈরি করতেই হবে

অতিথি কলম

রাজীব কুমার

২০১৪-র লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে নরেন্দ্র মোদীর দেশবাসীর কাছে দেওয়া 'আচ্ছে দিনের' প্রতিশ্রুতি মূলত দাঁড়িয়ে ছিল চিরাচরিত অনুদান বা জাতিভিত্তিক ভাতা ইত্যাদি বিলিয়ে দেওয়ার পরিবর্তে কর্মক্ষমদের যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরি দেওয়ার ওপর। যাতে তারা সম্মানের সঙ্গে পরিবার নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এই প্রসঙ্গে সদ্য সদ্য Labour Bureau থেকে পাওয়া পরিসংখ্যানগুলি কিন্তু আদৌ আশাব্যঞ্জক নয়।

আটটি মূলত শ্রম নিবিড় ক্ষেত্রগুলিতে (কাপড়, তৈরি জামাকাপড়, চর্ম দ্রব্য, গয়নাগাঁটি, বিপিও, হস্তশিল্প, ধাতু ও গাড়িশিল্প) ২০১৫ সালে নতুন চাকরির পরিমাণ ১.৩৫ লক্ষ যা গত বছর সমসময়ে ছিল ৪.৯ লক্ষ। আর ২০০৯ সালে তার সংখ্যা ছিল বিপুল ১২.৫ লক্ষ। কিন্তু সবচেয়ে আশঙ্কার কথা ২০১৫-র অর্থবর্ষের শেষ ত্রৈমাসিকে এই সংখ্যা নেতিবাচক হয়ে যায়। অবশ্যই এটা মেনে নিতে কোনো বাধা নেই যে আটটি ক্ষেত্র থেকে মাত্র

> **এই প্রথম কোনো সরকারের আমলে দেশের বাজেটে চাকরি সৃষ্টির খাতে সরাসরি রাজস্ব বৃদ্ধির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ২০১৬ সালের গোড়াতেই শুরু হওয়া stand up ও Start up প্রকল্প দুটির পেছনে সরকারের বিপুল সমর্থন ও আর্থিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি থেকেই বোঝা যায় চাকরি সৃষ্টির ব্যাপারে সরকার অবশ্যই আন্তরিক।**

১৮০০-২০০০ শিল্প উদ্যোগ বেছে নিয়ে নমুনা সংগ্রহ করে পুরোপুরি সঠিক বিশ্লেষণে পৌঁছে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া হয়তো ঠিক নয়। কিন্তু তবুও এই ধরনের খারাপ পরিসংখ্যান নিয়ে উৎসাহী মহল প্রচারের সুযোগ কখনই হাতছাড়া করবে না।

সেই অর্থে অর্থনীতির অন্যান্য যে-কোনো দিকের থেকে চাকরি সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে সাফল্যই মোদী সরকারের ভবিষ্যৎ নির্বাচনী সাফল্যের চাবিকাঠি। শুধু তাই নয়, বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে দেশের অভ্যন্তরে সামাজিক শান্তি, শৃঙ্খলা, স্থায়িত্ব বজায় রাখার ক্ষেত্রেও যুবসম্প্রদায়ের হাতে কাজ থাকার একটা বড় ভূমিকা রয়েছে। কথাটার হাতেনাতে প্রমাণ পাওয়া গেল অসমে কঠিন নির্বাচনী যুদ্ধে অবতীর্ণ প্রবীণ তরুণ গগৈ Labour Bureau-র এই তথ্য হাতে পাওয়া মাত্র ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রচার চালালেন বিগত সাত বছরের মধ্যে এই সরকারের আমলে চাকুরিক্ষেত্রে বৃদ্ধি সব থেকে কম। গুজরাটের প্যাটেলদের বিক্ষোভ বা হরিয়ানায় জাঠেদের সদ্য তুমুল অসন্তোষ ও অস্থির পরিস্থিতির মূলেও 'নব্য মধ্যবিত্ত শ্রেণী'র মধ্যে এই চাকরি না পাওয়ার হতাশা। পরিসংখ্যানে চাকরির বাজারের সেই দৈন্যই প্রকট হয়েছে। এই মর্মে ইঞ্জিনিয়ার ও ম্যানেজমেন্ট কলেজগুলি থেকে ক্যাম্পাসিং করে সরাসরি ছাত্র নিয়োগ করার সংখ্যাও হ্রাস পাচ্ছে। আর একটি হিসেব অনুযায়ী ২০০৫ থেকে ১২ সালের মধ্যে দেশে ১ কোটি ৫০ লক্ষ চাকরি সৃষ্টি হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে ব্যাকলগ বা যাদের চাকরি দেওয়া যায়নি তাদের সংখ্যা ছিল ৫ কোটি। অর্থাৎ ওই ৭ বছরে দেশে ৫ কোটি তরুণ বেকারের সৃষ্টি হয়েছিল। চিন্তার কারণ এটাই যে আগামী ১০ বছরে আরও ৮০ লক্ষ ছেলে-মেয়ে চাকরির বাজারে হাত বাড়াবে। কিন্তু বাস্তবে রপ্তানি ক্ষেত্রে আয় কমে যাওয়া, বিদেশি ভ্রমণার্থীদের ক্ষেত্রে সংখ্যায় উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি না ঘটা, বেসরকারি উদ্যোগে বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে ভাটা এই সঙ্কেতগুলি থেকে বোঝা যায় চাকরির বাজার সঙ্কুচিত, মোটেই উজ্জ্বল নয়। কিন্তু এই ধারাকে উল্টে দিতেই হবে। তাই শুরুতেই আমাদের নজর করতে হবে নিয়োগের ক্ষেত্রে বাস্তব চিত্রটা ঠিক কীরকম। এক্ষেত্রে সঠিক সর্বশেষ সরকারি নির্ভুল পরিসংখ্যান হাজির না থাকায় কিছুটা অন্য হিসেব-নিকেশ থেকে পরিস্থিতির মূল্যায়ন করতে হবে। এই ধরনের দুটি সম্ভাব্য হিসেব পাওয়া গেছে। অবশ্যই দু'টিই বেসরকারি করপোরেট ক্ষেত্র থেকে। ২০১৬ সালের মার্চে দি মনস্টার এমপ্লয়মেন্ট ইনডেক্স অনুযায়ী চাকুরি ক্ষেত্রে নিয়োগের অনলাইন এমপ্লয়মেন্ট পোর্টাল-এর মাধ্যমে চাকুরি প্রার্থীদের ডাকার ক্ষেত্রে ১৩টি পরিষেবা ক্ষেত্রের শিল্পোদ্যোগীদের চাহিদা ৪২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা অবশ্যই নজরকাড়া। নতুন হেয়ারিং-এর ক্ষেত্রে এই চাহিদা বৃদ্ধি অবশ্যই

আশাব্যঞ্জক।

অন্যদিকে Team Lease Employment outlook Report 2015-16 অনুযায়ী আরও ভাল খবর আছে। এদের সমীক্ষা যে ৬১৬ জন নিয়োগকর্তা কোম্পানি বা সংস্থার ওপর চালানো হয়েছিল তার মধ্যে ৯৩ শতাংশই ২০১৫-১৬ সালে নতুন লোক নেবার কথা বলে। এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ সমীক্ষা থেকে উঠে আসে যে নিয়োগ বৃত্ত (Employment Cycle) এবার ভাল দিকে আবর্তন করছে। তবু ঘুরেফিরে সেই একই কথা বলতে হবে যে উৎপাদন শিল্পের ক্ষেত্রটি যেন সেই 'লেট লতিফ' হয়েই পড়ে আছে। দ্বিতীয়ত, সেই অর্থে আমাদের হাতে নিরেট কোনো ধারণা নেই যে ঠিক কত চাকরি তৈরি হতে পারে। শুধু তাই নয়, যে নতুন চাকরিগুলি তৈরি হবে তার বিরাট অংশই হবে মেট্রো বা টায়ার ওয়ান সিটিগুলিকে ঘিরে। অন্যদিকে টায়ার ২ ও ৪ সঞ্চার আওতায় থাকা শহরগুলি ও গ্রামাঞ্চলে এই চাকরি বৃদ্ধির সংখ্যা হবে নগণ্য। ফলে সেখানকার চাকরির বাজারের বৃদ্ধি আশাপ্রদ হবে না। কিন্তু এর ফল হতে পারে ভয়ঙ্কর। এই ট্রেন্ড চলতে থাকলে প্রাদেশিক বৈষম্য দেখা দেবে আর অর্থনীতির গাড়ি দু'রকম গতিতে চলবে। পরিণতিতে কতিপয় বড় বড় শহরের পরিকাঠামোর ওপর বিপুল চাপ আসতে বাধ্য। অন্যদিকে দেশের বিশাল গ্রামাঞ্চল পিছিয়েই পড়ে থাকবে। এইরকম একটা পরিস্থিতি ঠিক গ্রহণীয় নয়, কেননা তা ঘোষিত 'Inclusive Growth' বা 'সবকা সাথ'-এর পরিপন্থী।

আশার কথা, এই প্রথম দেশের বাজেটে চাকরি সৃষ্টির খাতে সরাসরি রাজস্ব বৃদ্ধির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ২০১৬ সালের গোড়াতেই শুরু হওয়া stand up ও Start up প্রকল্প দুটির পেছনে সরকারের বিপুল সমর্থন ও আর্থিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি থেকেই বোঝা যায় চাকরি সৃষ্টির ব্যাপারে সরকার অবশ্যই আন্তরিক। কিন্তু আদতে start up প্রকল্পগুলিতে বড় সংখ্যার নিয়োগ সম্ভব নয়, কেননা এগুলি প্রধানত কাজ করছে কম শ্রম নিবিড় আইটি ক্ষেত্রে। অন্যদিকে আবার stand up মূলত কারুকর্মী ও পারিবারিক উদ্যোগগুলির সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করার উদ্দেশ্যেই তৈরি। ফলে এখানে যে চাকরি তৈরি হবে তা সবই অর্থনীতির অসংগঠিত ক্ষেত্রে (ইনফরম্যাল সেক্টর)। ভাবতে হতাশ লাগলেও এই দুটি উদ্যোগ কখনই যথেষ্ট নয়। কেননা প্রথম ক্ষেত্র প্রয়োজনীয় চাকরির সংখ্যা তৈরি হবে না আর দ্বিতীয়টিতে যে কেতাদুরস্ত (ফরম্যাল) চাকরি আজকের নবীন ভারতীয় প্রজন্ম আকাঙ্ক্ষা করে ঠিক তা তৈরি হবে না।

তাই মনে হয় আরও অনেক কিছুই করা দরকার আর খুব তাড়াতাড়ি। কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটা কথা সব সময় মনে রাখতে হবে যে সেই নিয়তির ওপর ছেড়ে দিয়ে 'এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় আর চাকরি-বাকরি কিছু হবে না। অর্থনীতির যে জোরই নেই'—এমন নেতিবাচক কথাবার্তা পুরোদস্তুর বন্ধ করতে হবে। এই কারণে আমাদের রাজনীতিকদের, সরকারের অর্থনীতি দপ্তরের কেষ্টা বিষ্টু সর্বোপরি বিজেপির মুখপাত্রদের উঠতে বসতে জিডিপি বৃদ্ধি নিয়ে বাগাড়ম্বর না করে বরঞ্চ সভা সমিতিতে আলোচনার মাধ্যমে কোন কোন ক্ষেত্রে বা অঞ্চলে যথেষ্ট চাকরির সুযোগ তৈরি হয়েছে বা কোথায় উন্নয়নের কাজের ফলে কতজন চাকরি পেল যুবসমাজের পক্ষে এমন সব সুখবর দেওয়ার চেষ্টায় মন দেওয়া উচিত। এর ফলে নবীন চাকুরি সন্ধানীরা সরকারের ওপর আস্থাশীল হবে আর সরকারের বিশ্বাসযোগ্যতার সঙ্গে তারা যে যথার্থই চাকরিপ্রার্থীদের নিয়ে ভাবে তারও প্রমাণ দেওয়া হবে।

মোদীর পক্ষে এই মুহূর্তে অন্য যে-কোনো প্রকল্প, পরিকল্পনা অগ্রাধিকারকে একটু পাশে রেখে সমস্ত দৃষ্টি প্রায় লেসার (Leaser)- এর দ্যুতিতে চাকরি সৃষ্টির দিকে নিবদ্ধ রাখা প্রয়োজন। সফল হলেই উন্নয়নের গতি বেগবান হয়ে উঠবে। এই সুবাদে বলা দরকার, রপ্তানি সংক্রান্ত ক্ষেত্রের ওপর বিশেষ নজর দেওয়া, ছোট ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়নের সঙ্গে কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের ওপর সবিশেষ গুরুত্ব দেওয়া দরকার। কেননা এখানে নিযুক্তির সম্ভাবনা বেশি (শ্রমনিবিড়) এবং বৃদ্ধির নিশ্চয়তাও রয়েছে। এই উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ উপদেষ্টা দল তৈরি করা খুব দরকার। যার মধ্যে থাকবে সমস্ত সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও নানান এজেন্সি সংস্থা যারা এই কাজে অভিজ্ঞ। এই কাজে সাফল্য আনতেই হবে। উল্লেখিত Task force ও Agency গুলির একটিই লক্ষ্য থাকবে পরিকল্পনা সফল করা। সময় আদৌ নেই। ■

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

বিশেষভবে অনুরোধ জানানো হচ্ছে যে, সরাসরি ব্যাঙ্ক মারফৎ বা মণিঅর্ডার যোগে স্বস্তিকায় টাকা পাঠালে সেই টাকা কী বাবদ পাঠালেন তা সঙ্গে সঙ্গে স্বস্তিকা দপ্তরকে জানান। গ্রাহকদের টাকা পাঠালে তাঁদের সম্পূর্ণ নাম ও ঠিকানা (ফোন নং-সহ) পাঠাতে হবে। অন্যথায় নাম না জানার কারণে আপনাদের পাঠানো টাকার কোনো রসিদ কাটা আমাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। যার ফলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে নতুন গ্রাহকের টাকা পাঠানো সত্ত্বেও যেমন পত্রিকা পাঠানো সম্ভব হচ্ছে না, তেমনই বকেয়া টাকার কারণে কারও কারও পত্রিকা সরবরাহ বন্ধ করে দিতে হচ্ছে। এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতির হাত থেকে বাঁচতে আপনাদের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন।

ইতিমধ্যে আপনি যদি ব্যাঙ্ক মারফৎ স্বস্তিকাতে কোনো টাকা পাঠিয়ে থাকেন তাহলে কবে পাঠিয়েছেন, কত টাকা পাঠিয়েছেন এবং কি বাবদ পাঠিয়েছেন অনুগ্রহ করে সত্বর আমাদের জানান। ব্যাঙ্ক মারফৎ টাকা পাঠালে ব্যাঙ্ক যে রসিদ আপনাকে দেয় সেই রসিদের জেরক্স কপিটা আমাদের পাঠালে ভালো হয়।

— ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

ভাগ্যিস কানহাইয়া ছিল!

সত্যিগুলো একে একে সামনে আসছে

দিব্যজ্যোতি চৌধুরী

ছাত্র রাজনীতি মোটেই অবাঞ্ছিত নয়, কিন্তু ছাত্র-সংসদগুলির রাজনীতিকরণের কারণে আজ অযথা অনেক অপ্রিয় পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে। যেভাবে ছাত্র নেতারা নিজেদেরকে একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক শ্রেণী তৈরি করার চেষ্টা চালাচ্ছে তা রীতিমতো নজরে পড়ার মতো। এটি মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। কোনো বিষয়ে ভিন্ন মানুষের ভিন্ন মত থাকতে পারে। অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার এটা। একে কোনো ভাবেই মতবিরোধ বলা চলে না। অথচ এই মত পার্থক্যকে সংঘাতে পরিণত করার জন্য ছাত্ররাজনীতিকে উদ্দেশ্যমূলক ভাবে ব্যবহার করার প্রবণতা আজকাল বেশ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। জাতীয়তাবাদ ও দেশাত্মবোধ নিয়ে এমন অস্বাস্থ্যকর বিতর্ক এর আগে কখনো দেখা যায়নি। একটা নির্দিষ্ট মতে বিশ্বাসী কিছু ছাত্রের নেতাকে সমগ্র যুবসমাজের মুখ করে তোলার অশুভ চেষ্টা চলছে। দেশ বা সমাজের জন্য যাদের বিন্দুমাত্র অবদান নেই সেই কুচক্রীদের বেড়ে ওঠার জন্য গণতন্ত্রের থেকে ভালো কোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থা নেই এমন ধারণা হওয়াটা নিতান্ত অমূলক নয়।

এমন একটা পরিস্থিতিকে কাজে লাগাতে রাহুল গান্ধী, শশী থারুরের মতো কংগ্রেসী নেতারা মাঠে নেমে পড়েছেন। জে এন ইউ প্রাঙ্গণে ৪৩ মিনিটের ভাষণে থারুর ছাত্রসংসদ সভাপতি, রাষ্ট্রদ্রোহে অভিযুক্ত কানাহাইয়া কুমারকে শহিদ ভগৎ সিং-য়ের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এবছর নারী দিবসে কানহাইয়া মন্তব্য করেছেন, ''আমাদের যতই থামানোর চেষ্টা করা হোক না কেন, মানবাধিকার ভঙ্গের বিরুদ্ধে আমরা সোচ্চার হবই। আমরা 'আফস্পা' (AFSPA, ভারতীয় সংসদে পাশ হওয়া এই আইনে অশান্ত জায়গায় ভারতীয় সেনাবাহিনীকে বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে)-র বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলব। সেনাদের প্রতি আমাদের অনেক শ্রদ্ধা রয়েছে, তবুও বলব যে কাশ্মীরি মহিলারা নিরাপত্তাবাহিনীর লোকেদের হাতে ধর্ষিতা হচ্ছেন।'' অন্যদিকে, ক্রিকেটে ভারতের হার নিয়ে যে সমস্ত কাশ্মীরি ছাত্ররা উল্লাস করছিল, তাদের প্রতিবাদ করায় এনআইটি-তে অ-কাশ্মীরি ছাত্রদের উপর অকথ্য পুলিশি নির্যাতনের মধ্যে তিনি কোনো অন্যায় দেখতে পাননি। হাজার হলেও তিনি বামদলের ছাত্রপ্রতিনিধি। তাঁর চরিত্রে দ্বিচারিতা থাকবে এর মধ্যে আশ্চর্যের কিছু নেই।

অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে, ভারতীয় সেনাবাহিনীর কিছু জওয়ানের বিরুদ্ধে এধরনের অভিযোগ আসছে। এই প্রবণতা নিঃসন্দেহে ভয়াবহ। সেনাবাহিনী এসব ক্ষেত্রে অপরাধী সেনাদের যথাযথ সাজাও দিচ্ছে। এর জন্য সমস্ত সেনাবাহিনীকে দোষী ভাবাটা ঠিক নয়। একইভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু ছাত্রের অভব্যতার কারণে কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের ছাত্রদের দানবীয় আচরণ করার নৈতিক অধিকার জন্মায় না। বস্তুত মহিলা সংক্রান্ত অপরাধ কোনো নির্দিষ্ট শ্রেণী বা সম্প্রদায় বা ধর্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। সমাজের বুকে দীর্ঘদিন ধরে বেড়ে ওঠা একটা পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা এর পেছনে কাজ করছে। এসব ক্ষেত্রে বেছে বেছে সমালোচনা করলে এর

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) তথ্য অনুযায়ী দেশের ১০৪টি উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে জেএনইউ-তেই সবচেয়ে বেশি যৌন নির্যাতনের ঘটনা ঘটে। অথচ জে এন ইউ-কেই দেশের সবচেয়ে বড় উদারমনা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে তুলে ধরা হয় যারা নাকি মহিলাদের বিষয়ে সবচেয়ে বেশি সংবেদনশীল! শুধু তাই নয়, জে এন ইউ ক্যাম্পাসের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে তৈরি করা গত এক বছরের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, জে এন ইউ ক্যাম্পাস এখন সংগঠিত দেহব্যবসায়ের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।

বিরুদ্ধে আন্দোলন অর্থহীন হয়ে পড়ে। কিছুদিন আগে কাশ্মীরের এক স্কুলছাত্রী সেনার হাতে তার শ্লীলতাহানির ঘটনা অস্বীকার করে, যদিও স্থানীয় লোকেদের বিক্ষোভের জেরে সে তার অবস্থান বদল করতে বাধ্য হয়। ঘটনাক্রমে সে স্বীকার করে যে স্থানীয় যুবকের হাতে নির্যাতিতা হয়েছে। তাতে করে কানহাইয়া ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের সেনাবাহিনীকে কলঙ্কিত করার ছক ভেস্তে যায়। হলিউডের এক বিখ্যাত ছবির নায়িকা মন্তব্য করেছেন যে, নারীবাদী আন্দোলনের প্রবক্তা পুরুষরাই, যাতে করে তারা আরোও কিছু লোককে বোকা বানাতে পারেন এমন এক বিশ্রী ধারণা তাঁর মনে বদ্ধমূল হয়েছে। তাঁর এই উপলব্ধির সারসত্য হলো এই যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে সমাজকর্মী এবং গণমাধ্যমের ছদ্মনারীবাদীরা অত্যন্ত নীচ পন্থায় নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য নারীর সম্মানকে ব্যবহার করেন।

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি লোকসভায় প্রতিবেদন জমা দিয়েছেন যাতে দেখা যাচ্ছে যে ২০১৩-১৪ সালে জেএনইউ-তে ২৫টির মতো যৌননির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) তথ্য অনুযায়ী দেশের ১০৪টি উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে জেএনইউ-তেই সবচেয়ে বেশি যৌন নির্যাতনের ঘটনা ঘটে। অথচ জে এন ইউ-কেই দেশের সবচেয়ে বড় উদারমনা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে তুলে ধরা হয় যারা নাকি মহিলাদের বিষয়ে সবচেয়ে বেশি সংবেদনশীল! শুধু তাই নয়, জে এন ইউ ক্যাম্পাসের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে তৈরি করা গত এক বছরের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, জে এন ইউ ক্যাম্পাস এখন সংগঠিত দেহব্যবসায়ের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। হস্টেলে যৌনকর্মীদের উপস্থিতি অতি সাধারণ ঘটনা। মদ খাওয়া-সহ 'অনৈতিক' কাজ করার অপরাধে শয়ে শয়ে পড়ুয়াকে দুই থেকে পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা করা হয় বলে দাবি করা হয়েছে প্রতিবেদনে। কিছুদিন আগে জে এন ইউ-এর সমাজতত্ত্ব বিভাগের এক পড়ুয়া মহিলা গবেষক তাঁর সুপারভাইজারের বিরুদ্ধে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ আনেন। সেই সুপারভাইজার অধ্যাপককে পরবর্তীতে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়। তবে সবচেয়ে মজার কথা হলো এই, যে ব্যক্তিটি জে এন ইউ-এরই প্রাক্তন ছাত্র তথা অতি-বাম সংগঠনের একজন সক্রিয় কার্যকর্তা, তাঁর বিরুদ্ধে কিন্তু কোনো এফ আই আর দায়ের করা হয়নি। আরও এক ঘটনায় দেখা যাচ্ছে যে এক পিএইচডি ছাত্র তাঁর শিক্ষিকাকে ধর্ষণ করেছে। জেএনইউ-তে এরকম অসংখ্য অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে যেখানে ছাত্ররা হয় তাদের সহপাঠিনীদের অথবা বহিরাগতদের ধর্ষণ করেছে।

মহিলাদের প্রতি যে-কোনো ধরনের হিংসাত্মক ঘটনাকেই দ্বিধাহীন ভাষায় নিন্দা করা উচিত। নিরাপত্তারক্ষীদের হাতে মহিলাদের শ্লীলতাহানির বিরুদ্ধে কানহাইয়ার আন্দোলন মান্যতা পেত যদি তিনি তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিযুক্ত শিক্ষক ও ছাত্রদের বিরুদ্ধেও সোচ্চার হতেন। বছর কয়েক আগে তিনি নিজেই এক অনৈতিক কাজের জন্য অভিযুক্ত হয়েছিলেন।

গত ২৯ মার্চ, 'জস্‌নে-ই-আজাদি' উৎসবে 'ভয়েসেস্ অব আজাদি' নামক এক আলোচনা চক্রে কানহাইয়া মন্তব্য করেছেন— ''জরুরি অবস্থা ও ফ্যাসিবাদের মধ্যে ফারাক আছে। জরুরি অবস্থার সময় একটি নির্দিষ্ট দলের লোকজনেরা গুণ্ডামিতে জড়িত ছিল, কিন্তু এই ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থায় সমগ্র রাষ্ট্রশক্তি গুণ্ডামির পথ নিয়েছে। ২০০২ সালের গুজরাটের দাঙ্গা ও ১৯৮৪ সালের শিখ বিরোধী দাঙ্গার মধ্যে একটা তফাত রয়েছে। একদল উন্মত্ত জনতা একজন সাধারণ লোককে মারছে আর রাষ্ট্রশক্তির দ্বারা গণহত্যার ঘটনার মধ্যে একটা মৌলিক প্রভেদ রয়েছে।''

বিশিষ্ট সাংবাদিক মনোজ মিত্তা এবং আইনজীবী এইচ এস ফুলকা তাঁদের বইতে ১৯৮৪ সালের দাঙ্গার প্রত্যক্ষদর্শীদের বহু বিবরণ তুলে ধরেছেন। তাতে দেখা যাচ্ছে যে, কংগ্রেসী নেতারা দাঙ্গাবাজদের নেতৃত্ব দিয়ে তিন দিন ধরে রাজধানীর বুকে একের পর এক শিখ রমণীকে ধর্ষণ করেছে, শিখ পুরুষদের হত্যা করেছে এবং তাঁদের দোকান-বাড়ি সব লুঠ করেছে। পুলিশ শুধু নীরব দর্শকই ছিল না, দাঙ্গাবাজরা পৌঁছনোর আগেই পুলিশ শিখদের হাত থেকে আত্মরক্ষার সমস্ত হাতিয়ার বাজেয়াপ্ত করেছে। তাই এক্ষেত্রে কানহাইয়ার যুক্তি একেবারেই ধোপে টেকে না। অর্বাচীন কানহাইয়া কি এটাও খবর রাখেন না যে দেশের সর্বোচ্চ আদালত মোদীজীকে নির্দোষ বলে রায় দিয়েছে এবং গুজরাট দাঙ্গা নিয়ে মোদীর বিরুদ্ধে দায়ের করা মিথ্যা মামলা মার্কিন আদালত গত ২০১৫ সালের ১৪ জানুয়ারি খারিজ করে দিয়েছে?

স্বঘোষিত এই ছাত্রনেতা যতই দেশের যুবসমাজের মুখ হয়ে উঠতে চান না কেন, তাঁর এই ধরনের দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য তাঁকে তাঁর লক্ষ্যে পৌঁছতে দেবে না।

বিপ্লবী ভগৎ সিং কখনোই কানহাইয়ার মতো বেছে বেছে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতেন না। গুরুমুখী হরফে লেখা 'কেন আমি নাস্তিক?' প্রবন্ধে ভগৎ সিং প্রায় সমস্ত ধর্মের একগুঁয়ে গোঁড়ামিগুলির সমালোচনা করেছেন।

হিন্দুধর্মকে কানহাইয়া যেমন কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন, তেমনি অন্য সব ধর্মকেও একইভাবে সমালোচনা করা দম আছে তাঁর? ভারতে দারিদ্র্যের জন্য যেভাবে তিনি মোদী সরকারকে দায়ী করছেন ঠিক সেই ভাবে পশ্চিমবাংলা আর কেরলের দারিদ্র্যের জন্য সিপিএম (এম) এবং সিপিআই-কে দায়ী করার সৎসাহস আছে তাঁর? গুজরাট দাঙ্গার ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য তিনি ভীষণভাবে সোচ্চার। কাশ্মীরের সংখ্যালঘু হিন্দুদের নির্যাতনের ব্যাপারেও কি তিনি কি একইভাবে সুর চড়িয়েছেন? সবক্ষেত্রে উত্তর একটাই— তা হলো 'না'। সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থ নিয়ে আর যুক্তিহীন বক্তৃতাবাজি দিয়ে কখনোই কেউ মানুষের অধিকার রক্ষার নির্ভীক সৈনিক হয়ে উঠতে পারে না।

তবুও বলব, ভাগ্যিস কানহাইয়া ছিল! তা না হলে গান্ধীদের বড় গর্বের জে এন ইউ-এর কুকীর্তির খবর এত সহজে সামনে আসতো না। কানহাইয়ার আন্দোলনের ভাবগতিক দেখেই তো আজকের যুবসমাজ বামপন্থী আন্দোলনের ভণ্ডামিটা সহজে বুঝতে পারছে। সাবাস কানহাইয়া কুমার!■

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা অগণিত কানহাইয়া কুমারের জন্ম দিতেছে

ড. ইন্দ্রজিৎ সরকার

সরকারি বিদ্যালয়গুলির সমস্যা আরও গভীরে পৌঁছিয়াছে। এইসব বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা গিনিপিগবৎ— তত্ত্ব পরীক্ষার বস্তু। যে সরকার ক্ষমতা দখল করিতেছে তাহার একটি তত্ত্ব লইয়া এই গিনিপিগদের উপর পরীক্ষা চালাইতেছে। শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর কথা শোনা হয় না; শিক্ষকদের মত গ্রহণ করা হয় না; শিক্ষাবিদদের ধ্যান-ধারণার মূল্য দেওয়া হয় না। যেহেতু আমি ভোটে জিতিয়া শাসনযন্ত্রটির চালক হইয়াছি অতএব আমি সব বুঝিয়া গিয়াছি। আমি যাহা করিব তাহাই ঠিক।

আজকাল বিদ্যালয়গুলি শুধু বিদ্যাদান করিয়া ক্ষান্ত হয় না। তাহাকে অন্নদান করিতে হইবে, ঔষধদান করিতে হইবে, বস্ত্রদান করিতে হইবে, সাইকেল দান করিতে হইবে, অর্থদান করিতে হইবে, পুস্তক দান করিতে হইবে। বিদ্যালয়গুলি যেন দাতব্য দ্রব্যালয় হইয়া গিয়াছে। ফলে বিদ্যাচর্চা উঠিয়া গিয়াছে। শিশুরা এখন আর বিদ্যামুখী নাই; বিদ্যালয়মুখী হইয়া উঠিয়াছে। শিশুকে বিদ্যালয়মুখী করিয়া তোলাই তো লক্ষ্য; বিদ্যামুখী নহে। কারণ, তাহাতেই পলিটিকস্ আছে। আমি একবারও বলিতেছি না যে, শিশুর অন্নবস্ত্র পুস্তক ঔষধ সাইকেল অর্থ— ইত্যাদির আবশ্যকতা নাই। আমার বক্তব্য, বিদ্যালয়গুলিকে দাতব্য দ্রব্যালয় না করিয়া অন্য কোনো উপায়ে ওইসব শিক্ষার্থীর নিকট পৌঁছাইয়া দিবার ব্যবস্থা করা।

এইসব দান খয়রাতের ফলে সমস্যা হইল, বিদ্যালয়ে পঠন- পাঠনের বড়ই অসুবিধা। একে তো প্রয়োজনের তুলনায় শিক্ষক কম, ক্লার্ক কম, অন্যান্য অশিক্ষক কর্মী কম, তাহার উপর দান-খয়রাতির ব্যবস্থা করিতে করিতে বিদ্যালয়গুলির নাভিশ্বাস উঠিতেছে। ফলে, লেখাপড়া শিকেয় উঠিয়াছে। সরকার ইহা জানে বলিয়াই অষ্টমশ্রেণী পর্যন্ত পাশ-ফেল প্রথা তুলিয়া দিয়াছে। বিদ্যালয়গুলি 'হরিঘোষের গোয়াল'-এ পরিণত হইয়াছে। আরও সমস্যা হইল, লটারির মাধ্যমে ছাত্রভর্তি করায় বিদ্যালয়গুলিতে মুড়ি-মিছরি সমান হইয়া গিয়াছে।

একটি সহজ-সরল সত্য কথা স্বীকার করিতে দোষ নাই— পশ্চিমবাংলায় মুষ্টিমেয় কতিপয় বিদ্যালয় আছে, যেখানে যথার্থ লেখাপড়া হয়। বাকি সব বিদ্যালয় বেকার সমস্যা সমাধানের কারখানা। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির অবস্থা বহু বৎসর যাবৎ এইরূপ ছিল। শিক্ষার অধিকার আইন পাশ হইবার পর মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির অবস্থা এইরূপ হইয়াছে। পঠন-পাঠন এখন গৌণ। মুখ্য হইল অন্নদান- বস্ত্রদান, ঔষধ দান, সাইকেল দান। এই দানসত্র যে বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠনের কত ক্ষতি করিতেছে তাহা সচেতন ব্যক্তিমাত্রই বুঝিতে পারিবেন। মানব-সম্পদ যে কীভাবে নষ্ট হইতেছে তাহা কল্পনা করা যায় না। পাশাপাশি প্রাইভেট স্কুলগুলিতে পড়াশোনার পরিবেশ অনেকটা ভালো। এই স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা জানে লেখাপড়া না করিলে উপায় নাই। শিক্ষক মহাশয়রা জানেন, না পড়াইলে চাকরি থাকিবে না। কর্তৃপক্ষ জানে, না পড়াইলে ব্যবসায় চলিবে না। ছাত্রছাত্রী ভর্তি হইবে না। অর্থাৎ ভালো হউক আর মন্দই হউক প্রাইভেট বিদ্যালয়গুলির মধ্যে একটি লুকানো প্রতিযোগিতা আছে। যাহা সরকারি বিদ্যালয়গুলিতে নাই। এই সরকারি বিদ্যালয়ে একবার প্রবেশ করিতে পারিলে চাকুরি যাইবার সম্ভাবনা নাই। একটি প্রবাদ আছে— সরকারি চাকুরি পাওয়া যেমন কঠিন, তাহা যাওয়া আরও কঠিন। সুতরাং সরকারি সেক্টরগুলিতে কাজ হইবে কেন? কাজ না করিলেও যেখানে ব্যাঙ্ক-অ্যাকাউন্টে বেতন চলিয়া যায় এবং যে বেতন বন্ধ করিবার ক্ষমতা স্বয়ং বিধাতারও নাই সেখানে কাজ করিব কেন? ইহাই এখন দস্তুর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সমাজের সর্বক্ষেত্রে এইরূপ অবস্থা যখন প্রচলিত, তখন কেবল শিক্ষাক্ষেত্রে ইহার প্রভাব পড়িবে না তাহা কখনও হয় না। গ্রামে আগুন লাগিলে দেবালয়টিও পুড়িয়া যায়, তাহা রক্ষা পায় না। ইহাই কঠোর বাস্তব।

বিদ্যালয়গুলিতে পড়াইবার পরিবেশ নাই। কোনো বিদ্যালয়ে প্রয়োজন মতো শিক্ষক নাই। শিক্ষার অধিকার আইনে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত বলা হইলেও কোথাও তাহার যথাযথ ব্যবস্থা করা হয় নাই। ফলে বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠন ব্যবস্থা ক্রমশ ভাঙিয়া পড়িতেছে। বেশ কয়েক বৎসর হইল প্রাথমিক-মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ করা হয় নাই। সকল বিদ্যালয়ে শিক্ষকের অভাব রহিয়াছে। ফলত পঠন-পাঠন ব্যাহত হইতেছে। এখন আর বিদ্যালয়গুলি শিক্ষক নিয়োগ করিতে পারে না। এই বিষয়ে বিদ্যালয়ের কোনো দায় নাই। তবুও বহু বিদ্যালয় আছে, যেখানে পার্ট-টাইম শিক্ষকের সাহায্যে পঠন-পাঠন হইতেছে। বিদ্যালয়ে শিক্ষকের অভাব পঠন-পাঠনের অবনতির প্রধান কারণ। স্কুল সার্ভিস কমিশন কলকাতার শিক্ষককে সাগরের বিদ্যালয়ে পাঠাইতেছে। ফলে তিনি কেমন পড়াইবেন সহজেই অনুমান করা যায়। তিনি তো সর্বদা শহরমুখী থাকিবেন। পঠন-পাঠনে তাহার মন দিবার সময় কোথায়? এইভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে একটি নৈরাজ্যের অবস্থা ইদানীং দেখা যাইতেছে। নানাভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে এমন বিশৃঙ্খলা তৈয়ারি করা হইতেছে যাহাতে শিক্ষা সুদূর পরাহত। আর কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে তো লেখাপড়ার ব্যবস্থা চৌত্রিশ বৎসর ধরিয়া তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। এখনও সেই ধারা বজায় রহিয়াছে। এখন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলি রাজনৈতিক

দলের ক্যাডার তৈয়ারির কারখানা। বিশেষ বিশেষ কলেজ- ইউনিভারসিটি হইতে বিশেষ-বিশেষ রাজনৈতিক দলের ক্যাডার তৈয়ারি হয়। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও দেখিবেন, প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানগুলি সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিকে পিছনে ফেলিয়া দিতেছে। এমন একটি দিন শীঘ্রই আসিবে, যখন সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি উঠিয়া যাইবে— শিক্ষার দায়, দায়িত্ব সরকার আর লইবে না। শিক্ষা ব্যক্তিগত মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলির হস্তে অর্পিত হইয়া পণ্যে পরিণত হইবে। আর ইহার জন্য আমাদের ন্যায় সরকারি স্কুলের শিক্ষকরাও দায়ী থাকিব।

এবার প্রশ্নপত্রের দিকে তাকান। অধিকাংশ প্রশ্ন অবজেক্টিভ। ফলে ছাত্রছাত্রীরা কেবল ইন্‌ফরমেশনের ডিপো তৈরি হইতেছে। বুদ্ধিবৃত্তি হৃদয়বৃত্তি সব নষ্ট হইয়া যাইতেছে। যেমন ধরন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গুপ্তধন' গল্প হইতে প্রশ্ন করা হইল, 'শঙ্কর মৃত্যুঞ্জয়ের কে?' বলুন তো, ইহা জানিবার জন্য কি 'গুপ্তধন' গল্প পড়িতে হইবে? রবীন্দ্রনাথ কি এই ইনফরমেশনটি দিবার জন্য 'গুপ্তধন' গল্পটি লিখিয়াছেন? এরকম সহস্র প্রশ্নের উদাহরণ পর্ষদের বইগুলিতে পাইবেন। এইরূপ প্রশ্নের ফলে ছাত্রছাত্রীরা বাংলা-ইংরাজিতে আকাশছোঁয়া নাম্বার পাইতেছে; কিন্তু আপনার পাড়ার গভীর নলকূপটি খারাপ হইয়া গিয়াছে, সেটিকে সারাইবার জন্য পঞ্চায়েতে একটি দরখাস্ত লিখিয়া দিবার বিদ্যা আজিকার এম.এ., বি.এ. পাশ ছাত্রের নাই।

এখন আর পরীক্ষা নাই, মূল্যায়ন হইয়াছে। যাহার ফলে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সকলেই উন্নীত হইয়া যাইতেছে। কারণ বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিলেই ধাপে ধাপে উপরের ক্লাসে উঠাই শিশুর 'শিক্ষার অধিকার' বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। যেমন চলমান-সোপানের (এস্‌ক্যালেটর) একটি ধাপে দাঁড়াইতে পারিলেই আপনা-আপনি উপরে উঠা যায়, তেমনই। শিশু কী শিখিল তাহা পরীক্ষা করার কোনো প্রয়োজন নাই। ফলে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া এক প্রকার উঠিয়া গিয়াছে। শিশু বুঝিয়া গিয়াছে চলমান-সোপানে যখন একবার চড়িতে পারিয়াছি তখন উপরে ঠিক উঠিয়া যাইব। কেহ বাধা দিতে পারিবে না। পরবর্তী স্তরে ছাত্রছাত্রীদের অবস্থা যে কীরূপ, তাহা মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক স্তরের পরীক্ষার খাতাগুলি দেখিলে বোধগম্য হয়। একটি বাংলা-বাক্য তাহারা শুদ্ধ করিয়া লিখিতে পারে না। হয় বানান ভুল, নয় syntax এ ভুল কিংবা subject এর ভুল থাকিবেই। একটি বিশুদ্ধ বাক্য আপনি ইহাদের নিকট আশা করিতে পারিবেন না। ইহাই বর্তমান শিক্ষার ফল। আর মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফল তো বোর্ড তৈয়ারি করিয়া দেয়; ছাত্রছাত্রীরা করিতে পারে না। যদি করিত, শতকরা দশজন উত্তীর্ণ হইত কিনা সন্দেহ। ইহার পর মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলি লক্ষ্য করুন— সেখানেও একই অবস্থা। ফলাফল তৈয়ারি করা হইতেছে। তারপর চাকুরির পরীক্ষা দেখুন— সেখানে তো দুষ্টচক্রের সিন্ডিকেট। ইহাই বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার পরীক্ষা পদ্ধতি। এই পরীক্ষা পদ্ধতির জন্য কত লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থীর জীবন নষ্ট হইয়া যাইতেছে তাহা কে বলিবে, আর কে-ই বা শুনিবে! এই বিষয়ের 'বক্তা শ্রোতা চ দুর্লভঃ'। বিদ্যালয়ে যদি এইভাবে শিক্ষার হদ্দ-মদ্দ হইয়া যায় তবে তো উচ্চশিক্ষার এই দুরবস্থা হইবেই। তাই পরীক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন করাও প্রয়োজন। একটি সার্বিক পরিবর্তন করিতে না পারিলে উন্নতশিক্ষা অসম্ভব।

একথা সত্য যে, মেকলে সাহেব আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার বারোটা বাজাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, মেকলে সাহেবের প্রেতাত্মারা আজও আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে দিতেছে না। সত্যজিৎ রায়ের 'হীরক রাজার দেশে' সিনেমায় হীরকরাজার শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষা সম্পর্কে একটি সুন্দর কথা বলিয়াছেন—

'লেখাপড়া করে যে/ অনাহারে মরে সে।
জানার কোনো শেষ নাই/ জানার চেষ্টা বৃথা তাই।।'

এই কথা বলিয়া, বিদ্যালয়ের ছাত্রদের চিরকালের মতো ছুটি দিয়া বিদ্যালয় তুলিয়া দিয়াছিলেন। বর্তমানে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীকে এই সুকর্ম করিতে হইবে না। বিদ্যালয়গুলি আপনা-আপনি উঠিয়া যাইবে। বিদ্যালয়ের কাজ তো বিদ্যাদান করা; আজিকার কোনো বিদ্যালয়ে বিদ্যাদান করা হয় কিনা কে জানে। বরং বিদ্যা ব্যতীত অন্য অনেক দ্রব্য দান করা হয়— অন্ন-বস্ত্র-পুস্তক-অর্থ-ঔষধ-সাইকেল আরো কত কী। তাই বিদ্যালয় থাকা কিংবা তুলিয়া দেওয়া সমান। বরং বিদ্যালয় রাখিয়া দেওয়া ভালো। কারণ বিদ্যালয়ের মাধ্যমে এইসব দ্রব্য সহজে মানুষের নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়া যায়। আর বিদ্যালয়গুলিতে যখন বিদ্যাদান করা হয় না; তখন তো তাহা এক প্রকার উঠিয়াই গিয়াছে। ছাত্রছাত্রীরা এখন বেলা আটটায় সুখনিদ্রা ত্যাগ করিয়া কোনোরকমে কাকস্নান করিয়া সাজিয়া গুছিয়া বিদ্যালয়ে গিয়া বাবা-মা-শিক্ষক- শিক্ষিকাকে কৃতার্থ করিয়া থাকে। তারপর বিদ্যালয় হইতে ফিরিয়া প্রাইভেট-টিউশন রূপ আড্ডালয়ে গিয়া ধরনা দেয়। অবশেষে রাত্রে ফিরিয়া কিছু খাইয়া ঘুমাইয়া পড়ে। ইহার অবসরে যেটুকু সময় পায়, তাহা টিভি, মোবাইল ফোন, কম্পিউটার, ল্যাপটপ প্রভৃতি খেলনা লইয়া সময় কাটায়। একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন, কী বিপুল পরিমাণ ছাত্রছাত্রী এইভাবে নষ্ট হইয়া যাইতেছে। কত প্রতিভা এইভাবে ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা ইহাদের মনের চাহিদা মিটাইতে পারিতেছে না। এই বিষয়টির প্রতি উদাসীন থাকিলে চলিবে না। ইহারা কী চায় তাহার সন্ধান করিতে হইবে। তাহাদের সুপথে পরিচালিত করিতে হইবে। ভারতবর্ষের জনসংখ্যার ষাট শতাংশ যুবক। এই সুযোগকে যদি আমরা কাজে লাগাইতে না পারি তবে দেশের উন্নয়ন সুদূর পরাহত। এই বিপুল সংখ্যক যুবসমাজের সম্মুখে কোনো আদর্শ নাই। বরং ভোগের রঙিন নেশা আছে। আজ পাড়ায় পাড়ায় ক্লাব তৈয়ারি হইয়াছে— সরকারি অর্থানুকূল্যে তাহারা ক্লাবঘরগুলিকে নানা কাজে ব্যবহার করিয়া অর্থোপার্জন করিতেছে। সেই অর্থে প্রত্যহ মদ্যপান করিতেছে। আজকাল স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রচুর মদ্যপ দেখা যাইতেছে। মেয়েরাও এখন মদ-গাঁজা খাইতেছে। ধীরে ধীরে সমস্ত জাতি উচ্ছন্নে যাইতেছে আর আমরা গদি-দখলের চেষ্টায় মাতিয়া রহিয়াছি এবং এই অর্ধ শিক্ষিত, অশিক্ষিত ছেলেমেয়েদের দাবার বোড়ের মতো আপন স্বার্থ চরিতার্থ করিতে ব্যবহার করিতেছি। ইহাই এখন আমাদের একমাত্র লক্ষ্য।

মেকলের উদ্দেশ্য আমরাই সিদ্ধ করিয়াছি। জাতির মেরুদণ্ড ভাঙিয়া দিয়াছি। বিদ্যালয়ে, বিশ্ববিদ্যালয়ে অগণিত কানহাইয়া কুমারের জন্ম দিয়াছি এবং দিতেছি। ■

মানুষের পাশে ঈশান

নিজস্ব প্রতিনিধি।। প্রদীপের তলায় অন্ধকারের মতো মুম্বইয়ের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে থাকা বস্তিগুলির একটি স্বাতীনগর কলোনি। বৃহন্মুম্বই কর্পোরেশনের অধীনে হলেও এই এলাকাবাসীরা বঞ্চিত শিক্ষা, স্বাস্থ্যের মতো পরিষেবা থেকে। সর্বশিক্ষা অভিযানে যেখানে শিক্ষার্থীদের স্কুলমুখী করার প্রয়াস চলে, সেখানে এই কলোনির শিশুরা কেবলই 'স্কুলছুট' হয়। কারণ একটি নালা। নালার নোংরা কালো জলে আশপাশের

সাঁকো তৈরির আগে ও পরে। সাঁকোর উপর দাঁড়িয়ে ঈশান বলবলে।

কারখানার বর্জ্য পদার্থ থেকে শুরু করে মলমূত্র, কাঁচের টুকরো, বিষাক্ত রাসায়নিক সবই মিশে থাকে। আর তার পাশেই ঝুপড়ি বানিয়ে বসবাস করে এই মানুষগুলো। নিজেদের পোড়া ভাগ্যের উত্তরাধিকার যাতে তাদের সন্তান সন্ততিকে ভোগ না করতে হয়, তাই শিক্ষার আলো তাদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে ভর্তি করে স্থানীয় স্কুলে। ওই কালো জল পেরিয়েই চলে খুদেদের স্কুলে যাওয়া। হাঁটুর ওপর পোশাক তুলে নালা পেরোতে গিয়ে কখনও নরম পায়ে ঢোকে কাঁচ, কখনও বা জলের তলায় কোনো বড় নুড়ি বা পাথরে হোঁচট খেয়ে টাল সামলাতে না পেরে ওই নোংরা জলেই পড়ে গিয়ে দূষিত জল ঢুকে যায় নাকে মুখে। চর্মরোগ তাদের সারা বছরের সঙ্গী। আর বর্ষাকাল এলে তো কোনো কথাই নেই। ৪-৫ ফুট চওড়া নালা আরো বিস্তৃত হয়ে ঢুকে পড়ে স্বাতী কলোনির ঘরে ঘরে। কয়েকজনের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটেছে এই কারণে। এছাড়া ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গুর কথা আলাদা করে বলার অপেক্ষা রাখে না। অবশেষে বাড়ির বড়রা বাধ্য হয়েই আশাভঙ্গের যন্ত্রণাকে বুকে চেপে ছেলেমেয়েদের স্কুল ছাড়াতে বাধ্য হয়।

এম এল এ, এম পি, কর্পোরেশনে হাজারবার আবেদন, অনুরোধেও এই মানুষগুলোর অবস্থা বিন্দুমাত্র বদলায়নি। অবশেষে তাদের এই সমস্যা নাগরিক সমাজের কাছে পৌঁছে দিতে 'মুম্বই মিরর'-এ একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। আর পাঁচটা শিক্ষিত মানুষের মতো ঈশান বলবলেও চোখ বুলায় এই খবরে। কিন্তু তাদের থেকে ঈশানের পার্থক্য হলো— তারা পড়ার পর সংবাদপত্র ভাঁজ করে রেখে দেয়, আর ঈশান সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট হয়। খবর প্রকাশিত হওয়ার পরই ঈশান এসে সবকিছু সরেজমিনে দেখে নেয়। সেখানকার ছোটোদের স্কুলে যেতে না পারার কষ্ট তাকে বিশেষভাবে নাড়া দেয়। একটি ডকুমেন্টারি ভিডিওতে সে জানায় যে সে নিজেকে খুবই ভাগ্যবান মনে করে, কারণ সে প্রত্যেকদিন অত্যন্ত আরামে গাড়িতে করে কলেজ যেতে পারে। তার নিজের কথায়, ''যখনই আমি এই লোকগুলোর দুর্দশা দেখলাম। তখনই ভেবে নিলাম এদের ন্যূনতম চাহিদাটুকু মেটাতে আমাকে কিছু করতে হবে।'' এরপরই ব্যক্তিগত উদ্যোগে নালার উপরে একটা সাঁকো তৈরির সিদ্ধান্ত নেয় সে। স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় নিজের খরচে বাঁশ ও কাঠ দিয়ে মাত্র আট দিনে ১০০ ফুট লম্বা ও ৪ ফুট চওড়া সাঁকো তৈরি করে ফেলে। একসঙ্গে ৫০ জন পারাপারের উপযোগী এই সাঁকো কলোনির ছোটোদের মুখে হাসি ফুটিয়েছে— এবার তারা আনন্দে স্কুলে যেতে পারবে, দিদিমণির মুখে পড়ার ফাঁকে গল্প শুনতে পারবে, বন্ধুদের সঙ্গে বসে 'অ-আ' পড়তে পারবে, নতুন ক্লাসে উঠতে পারবে। কেবল ছোটরা নয়, কলোনির ১৫ হাজার বাসিন্দার জীবনকে সহজতর করেছে এই সাঁকো। পিজিএমপি কলোনির সঙ্গে সঙ্গেই বাজার, কুরলা ও মনখুর্দ স্টেশনে যাওয়ার পথও সহজ হয়েছে।

সামাজিক মর্যাদায় আকাশ-পাতাল পার্থক্য সত্ত্বেও ঈশান আজ তাদের কাছে নিজের দাদা— 'ঈশান ভাইয়া'। ঈশান তাদের শিখিয়েছে কারোও দয়া-দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভর না করে স্বনির্ভর হতে। তার কাজে অনুপ্রাণিত হয়ে কলোনিবাসী নিজেরাই নালা সংলগ্ন আরেকটি সাঁকো তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে।

এইটুকু করেই অবশ্য থেমে নেই ঈশান। সে এবার ওই কলোনিতে বাসযোগ্য পরিবেশ গড়ার দিকে মনোযোগ দিয়েছে। ওয়ার্ড অফিস থেকে সে অনুমতি পেয়েছে আট-দশটা শৌচালয় বানানোর।

গত বছর ২৯ আগস্ট যখন ওই সাঁকোর উদ্বোধন হয়, তখন ঈশান ছিল বেদেকর কলেজের দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র। এই বয়সে তাঁর এমন জনহিতৈষী কাজের পিছনে রয়েছে তার বাবা-মায়ের প্রেরণা। তাঁরা থানেতে অবহেলিত শিশুদের নিয়ে একটি স্কুল চালান। এমনকী কিশোর বালবালে 'নির্ভয় যুব প্রতিষ্ঠান' নামে একটি এনজিও প্রতিষ্ঠা করেছেন দাতব্য চিকিৎসার জন্য। সে মনে করে যুবশক্তিই পারে দেশের অবস্থা ঠিক করতে। তাই যুবকদের নিয়ে ঈশান ঝাঁপিয়ে পড়েছে সমাজে চেতনা নির্মাণের কাজে।■

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৮১০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

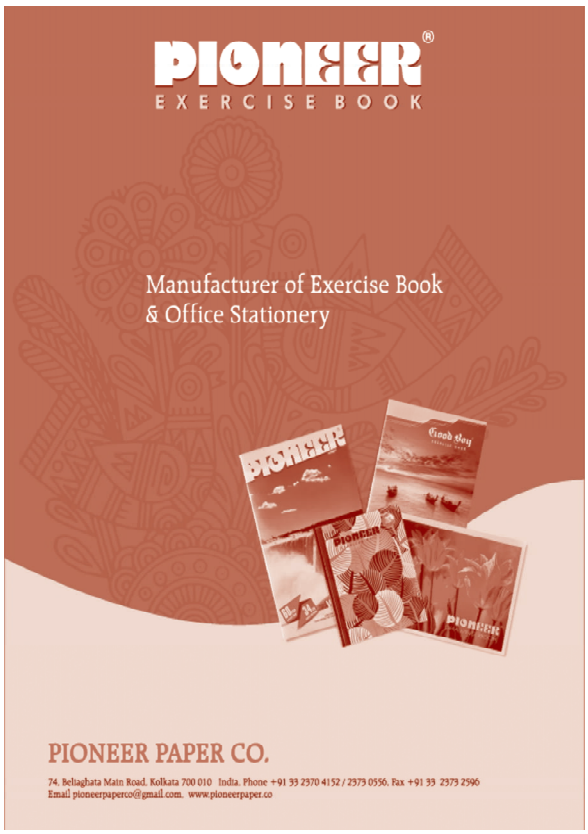

‘বিশেষ করে ভারতীয় শিল্পে অত্যধিক যুক্তিবাদী হওয়া বা যান্ত্রিক হওয়ার এক প্রবণতা আছে, যা কখনও কখনও শিল্পের সহজাত প্রকাশকে অভিভূত করে ও তাকে নষ্ট করে দেয়।’

— ভগিনী নিবেদিতা

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

পুস্তক প্রসঙ্গ

অমৃতকুম্ভের গাইড বুক

নবকুমার ভট্টাচার্য

তুলসীদাসের কোনো বাণীতে প্রয়াগে কুম্ভমেলার কোনো কথা পাওয়া যায় না, অথচ তুলসীদাস প্রয়াগের নিকটবর্তী স্থানে জন্মগ্রহণ করে ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে 'শ্রীরামচরিতমানস' রচনা আরম্ভ করেন। তুলসীদাসের তিরোভাবের (১৬২৩ খৃ.) প্রায় এক শতাব্দী পরে রামানন্দ শাখার শ্রীরামানন্দের পর দশম অধস্তন গোবর্ধনবাসী শ্রীব্রজানন্দজীর অভ্যুদয় হয়। তাঁর শিষ্য বালানন্দজী প্রবল প্রভাবশালী সাধু ছিলেন। কথিত রয়েছে ইনি কোনো এক সময়ে বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের সাধুদের একত্রিত করে 'সাধুসংরক্ষণী সেনাবাহিনী' গঠন করেন। সেই সাধু সৈন্যগণ 'লশকর' নামে খ্যাত হন। 'লশকর' শব্দের অর্থ পদাতিক সৈন্য। বালানন্দের শিষ্যসম্প্রদায় 'লশকর' নামে খ্যাত হন। বালানন্দ লশকরগণকে নিয়ে হরিদ্বার, প্রয়াগ, নাসিক ও উজ্জয়িনী এই চার স্থানে ধর্মপ্রচার করতেন। অনেকে মনে করেন বালানন্দজী লশকরকে নিয়ে উক্ত চারটি স্থানে যে যে ক্রমে ন্যূনাধিক তিন বৎসর অন্তর ভ্রমণ করতেন সেই ক্রমানুযায়ীই হরিদ্বার, প্রয়াগ, নাসিক ও উজ্জয়িনীতে সাধুগণের মেলা প্রবর্তিত হয়েছে। যে বৎসর হরিদ্বারে পূর্ণকুম্ভ হয় সেই বৎসরই বৃন্দাবনে বৈষ্ণবদের একটি প্রারম্ভিক কুম্ভমেলা বসে। এর কারণ বালানন্দজী বৃন্দাবনেই চার সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণবদের সৈন্যবাহিনী সংগঠন করে হরিদ্বার অভিযান করতেন। কেউ কেউ আবার বলে থাকেন, শঙ্করাচার্য ভারতের চার স্থানে চারটি মঠ স্থাপন করে কুম্ভযোগ উপলক্ষে সন্ন্যাসীরা যাতে প্রতি তিন বৎসর অন্তর হরিদ্বার, প্রয়াগ, নাসিক ও উজ্জয়িনীতে সম্মিলিত হয়ে ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে পরস্পর আলোচনা করবার সুযোগ পান তার ব্যবস্থা করেন। সেই সময় থেকেই উক্ত চার স্থানে কুম্ভযোগে সন্ন্যাসীদের সম্মেলন হয়ে আসছে। কুম্ভমেলার উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা প্রকার কিংবদন্তী প্রচলিত রয়েছে। কেউ কেউ কুম্ভযোগের সুপ্রাচীনত্ব প্রতিপাদনকল্পে বৈদিক ও পৌরাণিক প্রমাণ এবং পৌরাণিক আখ্যায়িকাসমূহের উল্লেখ করেন। শাস্ত্রে ও পুরাণে কুম্ভযোগের নিয়মকানুন ইত্যাদি রয়েছে। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ্ ভারতের যে যে স্থান ভ্রমণ করেছিলেন তার মধ্যে প্রয়াগ, হরিদ্বার, উজ্জয়িনী ও নাসিকের কিছু কিছু বিবরণ দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর লেখনীতে কুম্ভের বিবরণ নেই। ১০১৭ খৃষ্টাব্দে আলবেরুনী প্রয়াগের বিবরণ দিয়েছেন কিন্তু তাঁর বর্ণনায়ও কুম্ভের বিবরণ নেই। সম্রাট আকবরের সময়ের প্রসিদ্ধ ইতিহাস লেখক আব্দুল কাদীর বদায়ুনী ত্রিবেণী সঙ্গমের বর্ণনা দিলেও কুম্ভের কোনো উল্লেখ করেননি। তবে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে প্রয়াগের

কুম্ভমেলায় যোগদান করেছিলেন সন্ন্যাসী শিরোমণি স্বামী বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী। তৈলঙ্গস্বামী প্রয়াগের ত্রিবেণী সঙ্গম ঘাটের মাটি পবিত্র করেছিলেন ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে। কুম্ভমেলার ইতিহাস নিয়ে নানা কাহিনি রয়েছে, মেলার বর্ণনাও লিখেছেন অনেকেই। সমরেশ বসু থেকে আরম্ভ করে জয় গোস্বামীর কুম্ভ বিবরণ আমরা পড়েছি, আমরা পড়েছি অশোক কুণ্ডু থেকে শিবশঙ্কর ভারতীর কুম্ভকথা। তবুও কুম্ভ বিবরণ নিয়ে আমাদের কৌতুহলের শেষ নেই। লালঠাকুর হরিদ্বার, প্রয়াগ, নাসিক ও উজ্জয়িনীর কুম্ভমেলার নতুন কিছু দৃষ্টির প্রতি আলোকপাত করেছেন।

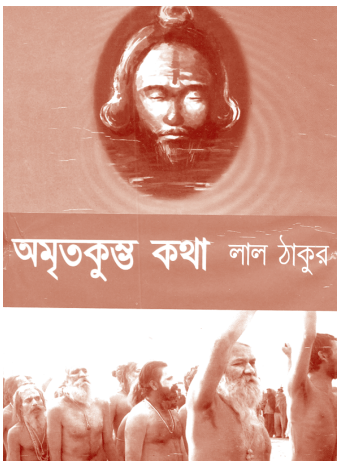

তিনি কুম্ভমেলায় নানা জনের সংস্পর্শে এসেছেন, নানা মার্গের সাধু দেখেছেন খুব কাছ থেকে। তাঁর লেখনীতে ফুটে উঠেছে সেই সব অভিজ্ঞতার কথা। তিনি লিখেছেন, 'কুম্ভের আক্ষরিক অর্থ কলস। হিন্দুদের কাছে এই কলসের বিশেষ মান্যতা আছে। হিন্দু সংস্কৃতিতে সকল শুভ কার্যের প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করা হয় এই কলস। যে কোনো শুভ উৎসবে, অনুষ্ঠানে, পূজার্চনায় ঘট স্থাপন করা হয় সর্বপ্রথম। এই হলো হিন্দুদের রীতি নীতি। বলাবাহুল্য অমৃত ভরা কুম্ভের মান্যতা মানুষের কাছে থাকবেই। আসলে মানুষগুলোএই কুম্ভমেলায় এসে তাদের 'মনকুম্ভটা' অমৃত দিয়ে ভরিয়ে নিয়ে যায়।'

ইতিমধ্যে নাসিক কুম্ভ শেষ হয়েছে। আগামী ২২ এপ্রিল ২০১৬ থেকে উজ্জয়িনী কুম্ভ আরম্ভ হয়েছে। ২১ মে পর্যন্ত এই কুম্ভপর্ব চলবে। কুম্ভে যাওয়ার পূর্বে লালঠাকুরের এই বইটি অবশ্যই পড়া উচিত। গল্পের ছলে উজ্জয়িনী কুম্ভমেলার ইতিহাস, সংস্কৃতি, দর্শনীয় স্থান সবই রয়েছে। অত্যন্ত সুখপাঠ্য এই বইটি কুম্ভগাইডেরও কাজ করবে। এই বইতে আরো রয়েছে গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, গোদাবরী ও শিপ্রা নদীর ভৌগোলিক ব্যাখ্যা, নাগা সন্ন্যাসীদের জন্মের ইতিহাস। লালঠাকুর তাঁর অভিজ্ঞতায় লিখেছেন, আজকের কিছু শিক্ষিত মানুষ ধর্মকে অবাস্তব, কাল্পনিক ও অপ্রয়োজনীয় মনে করলেও কুম্ভমেলায় এসে মনে হবে কথাটা সত্য নয়। মানুষের আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক জিজ্ঞাসার জবাব যুবসমাজ খুঁজতে আসে এই কুম্ভমেলাতে। উল্লেখ্য, আজকের কুম্ভমেলাগুলি শুধু বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা, সাধুদের মিলন মেলা নয়, যুবকদেরও ভিড় বাড়ছে কুম্ভমেলায়। আজকের যুবসমাজ আধ্যাত্মিক ভারতের সন্ধানে কুম্ভমেলায় উপস্থিত হচ্ছে। এটাই কুম্ভমেলার বিশেষ সাফল্য। লালঠাকুরের বইটি ছাপা প্রায় নির্ভুল এবং সুচারু পরিবেশনায় আকর্ষণীয়। বইটি পাঠক মহলে জনপ্রিয় হবে।

অমৃতকুম্ভ কথা (হরিদ্বার, প্রয়াগ, নাসিক, উজ্জয়িনী একত্রে)। লেখক : লালঠাকুর। প্রাপ্তিস্থান : ঘোষ অ্যান্ড চক্রবর্তী, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩। দাম : ২২০ টাকা।

বিশ্বভারতীতে শৈক্ষিক সঙ্ঘের সভা

বিশ্বভারতী শৈক্ষিক সঙ্ঘের ব্যবস্থাপনায় 'শিক্ষক—অতীত ও বর্তমান' শীর্ষক এক আলোচনা সভায় গত ২৪ এপ্রিল উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সহ-সরকার্যবাহ ড. কৃষ্ণগোপাল এবং বর্তমান সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক রন্তিদেব সেনগুপ্ত। কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সভাকক্ষে বিকাল ৫.৩০ মিনিটে প্রায় ৩০০ জন শিক্ষক, অধ্যাপক, ছাত্রছাত্রী ও বিশ্বভারতীর উপাচার্য স্বপন দত্ত'র উপস্থিতিতে প্রদীপ প্রজ্বলন করে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন ড. কৃষ্ণগোপালজী ও রন্তিদেব সেনগুপ্ত।

স্বাগত বক্তব্য রাখেন শৈক্ষিক সঙ্ঘের সভাপতি অধ্যাপক ড. চক্রধর ত্রিপাঠী। রন্তিদেব সেনগুপ্ত তাঁর বক্তব্যে বলেন, শিক্ষকের কাজ একজন সম্পূর্ণ মানুষ তৈরি করা। শিক্ষকের

মধ্যে সমস্ত মানবিক গুণের প্রকাশ থাকা প্রয়োজন, শিক্ষকের দায়িত্ব সুস্থ সমাজ গঠনে বড় ভূমিকা নেওয়া এবং সেই লক্ষ্যে ভারতীয় পরম্পরায় আস্থাশীল প্রকৃত দেশপ্রেমিক ছাত্রছাত্রী তৈরি করা শিক্ষকের অন্যতম কাজ হওয়া উচিত। তিনি শিক্ষকদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন যে, শিক্ষককে আগে নিজেকে প্রস্তুত হতে হবে এবং পরে পাঠক্রমের বাইরে ভারতের মহান দর্শন, প্রকৃত ইতিহাস, প্রকৃতি বিষয়ক চর্চা ও জীবন চর্চায় উৎসাহিত করতে হবে।

ড. কৃষ্ণগোপালজী তাঁর বক্তব্যে বলেন যে, আমাদের দেশ দীর্ঘদিন পরাধীন ছিল রাজনৈতিক ও সমাজব্যবস্থাতে। ভারতের অন্তরাত্মাকে কমজোর করে দেওয়া হয়েছিল, নষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল ভারতের পরম্পরা ও ঐতিহ্যকে। রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব সেই সঙ্কটজনক মুহূর্তে।

তিনি বলেন, গুরু একজন আদর্শ নাগরিক তৈরির প্রয়াস করেন যার ফলে ধীরে ধীরে বিদ্যার্থীর মনে স্বাভিমান বোধ তৈরি হয় সে যোগ্য হয়। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থাকে তিনি কটাক্ষ করে বলেন বর্তমান ব্যবস্থায় বিদ্যার্থী তথ্যভাণ্ডারে পরিণত হয়, তার প্রকৃত শিক্ষা হয় না। ভারতের শিক্ষক তাঁর অন্তর থেকে শিক্ষা দান করেন, গুরু বিদ্যার্থীর মধ্যে আধ্যাত্ম বিদ্যা প্রবেশ করান, তিনি হৃদয় শোধন করেন, বিদ্যার্থীকে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হতে শেখান। ভারতীয় পরম্পরায় জ্ঞান বিক্রি হয় না, ভারতের গুরু বিদ্যার্থীর মনের কথা বুঝতে, জানতে পারেন, তিনি বিদ্যার্থীর সঙ্গে একাত্ম হতে পারেন। শিক্ষককে বিদ্যার্থীর কাছে আদর্শ হতে হবে, শিক্ষক বিদ্যার্থীর মনে শ্রদ্ধা, ভক্তির ভাব জাগাবেন তাঁর নিষ্ঠা ও আচরণের মাধ্যমে তবেই তিনি হতে পারবেন আচার্য। ড. কৃষ্ণগোপাল বর্তমান শিক্ষকদের গুরু ও আচার্যরূপে নিজেদেরকে উন্নীত করার আহ্বান রেখে তাঁর বক্তব্য সম্পূর্ণ করেন।

সমাবেশ সমাচার

মালদা সংস্কার ভারতীর জেলা সম্মেলন

গত ২৬ এপ্রিল বিপুল সংখ্যক শিল্পীর উপস্থিতির মধ্য দিয়ে সংস্কার ভারতীর মালদা শাখার জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। শাখার সদস্য-সদস্যাদের পরিবেশিত ভাবসঙ্গীত দিয়ে সভার সূচনা হয়। উত্তরবঙ্গের প্রান্তের সহ-সভাপতি সঞ্জয় নন্দী, মাতৃশক্তি প্রমুখ রত্না নন্দী এবং সংগঠন সম্পাদক তড়িৎ মিশ্র সম্মেলনে উপস্থিতি ছিলেন। ভাবসঙ্গীতের পর সঞ্জয় নন্দীর সভাপতিত্বে সভার কাজ শুরু হয়। প্রথমে বিগত বছরের প্রতিবেদন পাঠ করেন বিদায়ী শাখা-সম্পাদক তন্দ্রা পাল। তাঁর পঠিত প্রতিবেদনের উপর সদস্য-সদস্যাদের গঠনমূলক আলোচনা করার জন্য আহ্বান জানান সঞ্জয় নন্দী। গিটার শিল্পী তাপস চক্রবর্তী সংগঠন পরিচালনার জন্য নতুন কিছু পদ সৃষ্টির প্রস্তাব দেন। এরপর অতি নিপুণতার সঙ্গে আয়-ব্যয়ের হিসাবের রিপোর্ট পেশ করেন শাখা-কোষাধ্যক্ষ সজল দত্ত। সঞ্জয় নন্দী সংগঠনের গঠনাবলী ও তার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। বিদায়ী সম্পাদক তন্দ্রা পাল আগামী দিনে সংগঠন পরিচালনার লক্ষ্যে কর্মকর্তাদের নামের একটি খসড়া তালিকা সভায় উপস্থাপন করেন। সভার উপস্থিত সকল সদস্য-সদস্যাদের মতবিনিময়ের মাধ্যমে কর্মকর্তাদের নাম ঘোষিত হয়। সভাপতি— জগন্নাথ দে, সহ-সভাপতি--- সুভাষ চক্রবর্তী, নৃত্য-প্রমুখ— সোমা ভট্টাচার্য, তালবাদ্য-প্রমুখ--- তপন হালদার, অঙ্কন-প্রমুখ— বিমল পাল, নাট্য-প্রমুখ— বিকাশ ঘোষ, মাতৃ-প্রমুখ— স্বাতী ঘোষ। বন্দেমাতরম্ সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। সভা পরিচালনা করেন সঞ্জয় নন্দী।

‘শ্রদ্ধা’র ৭৩তম শ্রদ্ধাঞ্জলি

গত ২৪ এপ্রিল সিউড়ী নব ডাঙ্গালপাড়াস্থিত গীতশ্রী অনুষ্ঠান ভবনে শ্রদ্ধার ৭৩তম শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সহস্রাধিক পূর্ণচন্দ্র দর্শনধন্য, ৮১ বছর বয়স্ক বর্ধমান জেলার ডিসেরগড় শহরের সাঁকতোরিয়া অঞ্চলের শ্রদ্ধেয় ত্রিলোচন মণ্ডলকে বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করা হয়। কোলিয়ারিতে কর্মরত অবস্থায় শ্রীমণ্ডল সমাজের বহু জনহিতকর কাজ করেছেন। সূর্যমন্দির ও ছিন্নমস্তার মন্দির নির্মাণ তাঁরই পরিচালনায় সংগঠিত হয়েছে।

শঙ্খধ্বনি ও মঙ্গলদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন লাউজোড় উচ্চবিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক জীবন মুখোপাধ্যায়। মানপত্র পাঠ করেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রাক্তন জেলা সভাপতি ও বর্তমানে সরস্বতী শিশু মন্দিরের জেলা সমিতির সভাপতি শান্তিকুমার মুখোপাধ্যায়।

উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন আকাশ বাণী ও দূরদর্শনের স্বনামধন্যা গায়িকা শ্রীমতী মহুয়া গোস্বামী ও অলকা গাঙ্গুলী। শ্রীমণ্ডলের হস্তপদ ধুইয়ে তুলসী, চন্দন, ফুল দিয়ে পূজন করেন তাঁর কন্যা শ্রীমতী সন্ধ্যা মণ্ডল। শ্রী মণ্ডলকে পরিধেয় বস্ত্র, উত্তরীয়, ফল, মিষ্ঠান্ন ও ভগবৎগীতা অর্ঘস্বরূপ প্রদান করা হয়।

শ্রদ্ধার পক্ষে বক্তব্য রাখেন বিশ্বনাথ চক্রবর্তী। পরিবারের পক্ষে তাঁর জামাতা। শ্রীমণ্ডল শ্রদ্ধার কার্যক্রমকে এক অভিনব অনুষ্ঠান বলে উল্লেখ করেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন পতিতপাবন বৈরাগ্য। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন সুব্রত সিনহা। শ্রীমতী মহুয়া গোস্বামীর সুললিত কণ্ঠে একটি ভজন পরিবেশনের পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

হাওড়ায় সংস্কৃত ভারতীর মানপত্র প্রদান

গত ৩০ এপ্রিল হাওড়া মহানগরের কেশব স্মৃতি ভবনে অনুষ্ঠিত হলো সংস্কৃত ভারতীর হাওড়া মহানগর শাখার উদ্যোগে পত্রাচার দ্বারা সংস্কৃত শিক্ষার প্রধাম অধ্যায় প্রবেশ পরীক্ষার্থীদের মানপত্র প্রদান অনুষ্ঠান। সমবেত ছাত্রীদের সরস্বতী বন্দনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। প্রধান অতিথির ভাষণে অধ্যাপক ড. পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় সংস্কৃত ভাষার লুপ্ত ইতিহাসের পুনরুদ্ধার, অবিরাম চর্চা ও পঠন-পাঠনের প্রয়োজনীয়তার ওপর বক্তব্য রাখেন। দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের সংগঠন সম্পাদক প্রণব নন্দ সারা রাজ্যে সংস্কৃত শিক্ষার প্রচার প্রসারে সংস্কৃত ভারতীয় উদ্যোগের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। শ্রীমতী পারুল চ্যাটার্জীর সুললিত কণ্ঠে বেদ-বন্দনা ও ছাত্রীদের সমবেত সঙ্গীত অনুষ্ঠানে একটি অন্য মাত্র যোগ করে। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন কালিপ্রসাদ ভট্টাচার্য এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সঞ্জয় বসু।

পরলোকে বলাই চট্টোপাধ্যায়

বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর শাখার প্রবীণ স্বয়ংসেবক বলাই চট্টোপাধ্যায় গত ১১ এপ্রিল বিষ্ণুপুর দক্ষিণ বৈলাপাড়ায় স্বগৃহে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। তিনি সহধর্মিণী, আত্মীয়স্বজন ও বহু গুণমুগ্ধজনকে রেখে গেছেন।

বলাই চট্টোপাধ্যায় ছাত্রাবস্থায় সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক হন। রেল বিভাগে চাকরি করতেন। চাকরি সূত্রে বিভিন্ন স্থানে কর্মরত থাকাকালীন সঙ্ঘকার্য বিস্তারে সক্রিয় ভূমিকা নেন। তাঁর জন্মস্থান বিষ্ণুপুর মহকুমার অন্তর্গত রাধানগর গ্রামে শাখার শুরুতে তাঁর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর তিনি বিষ্ণুপুর মহকুমার সঙ্ঘকার্য বিস্তারে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর বাসগৃহ সঙ্ঘকার্যের প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে। তিনি বিষ্ণুপুর নগরের সরস্বতী শিশু মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন। সঙ্ঘকার্য ছাড়া তিনি ছিলেন পরিবেশ প্রেমিক। তার বাড়িতে তিনি তৈরি করেন বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ নিয়ে বাগান এবং কুকুর-বিড়াল-পাখির থাকার আস্তানা।

শোক সংবাদ

কলকাতা মহানগর বৌদ্ধিক প্রমুখ প্রশান্ত চৌধুরীর মাতৃদেবী লিলি চৌধুরী গত ২৯ মার্চ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর। তিনি ২ পুত্র, ২ পুত্রবধূ ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন। উল্লেখ্য, সঙ্ঘের প্রচারক ও স্বয়ংসেবকদের তিনি পুত্রবৎ স্নেহ করতেন।

পুরুলিয়া কোর্টে অখিল ভারতীয় অধিবক্তা পরিষদ জয়ী

পশ্চিমবাংলায় ২০১৬ বিধানসভা নির্বাচনের সময়কালে পুরুলিয়া জেলা আদালতে আইনজীবীদের বার কাউন্সিলের পরিচালনা সমিতির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। অধিবক্তা পরিষদের পুরুলিয়া শাখা 'ন্যাশনালিস্ট ল' ইয়ার্স ফোরাম' এই পরিচালনা সমিতি নির্বাচনে উল্লেখযোগ্য বিজয়ী হয়। বার কাউন্সিলের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন অতুলচন্দ্র মাহাত এবং সহ-সভাপতি হিসাবে সন্দীপ ব্যানার্জী নির্বাচিত হন। পুরুলিয়ার বার কাউন্সিলে, এই নির্বাচনের ফলাফল অখিল ভারতীয় অধিবক্তা পরিষদকে এক বিশিষ্ট স্থানে পৌঁছে দিল।

কলকাতা মহানগরে কুটুম্ব প্রবোধনের বিশেষ কার্যক্রম

গত ৮ থেকে ১০ এপ্রিল বর্ষপ্রতিপদ উপলক্ষে কলকাতা মহানগরে ৩ দিন ব্যাপী কুটুম্ব প্রবোধনের বিশেষ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। দক্ষিণ কলকাতায় মহানগর প্রমুখ শ্রী ওমপ্রকাশ রাওয়াতের বাসগৃহে।

মঙ্গলনিধি

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বসিরহাটে জেলা ব্যবস্থা প্রমুখ প্রত্যুষপ্রকাশ সরকার ও প্রিয়ংবদা সরকারের শুভ বিবাহের প্রীতিভোজ অনুষ্ঠানে মঙ্গলনিধি প্রদান করা হয় বসিরহাট জেলার সঙ্ঘচালক সুকুমার বৈদ্যের হাতে। উপস্থিত ছিলেন পরিবার প্রবোধনের প্রান্ত প্রমুখ অমরকৃষ্ণ ভদ্র, সীমা জাগরণ মঞ্চের প্রান্ত সংগঠন সম্পাদক জগন্নাথ সেনাপতি, জেলা প্রচারক তাপস গরাই, মহকুমা প্রচারক দীপ্তাশিস দত্তরায়, সহ-জেলা কার্যবাহ রবিশঙ্কর পাল-সহ বহু কার্যকর্তা।

* * *

উত্তর মালদা জেলার গৌরহন্ড মণ্ডল কার্যবাহ পীযূষ মণ্ডল তাঁর দাদা কৌশিক মণ্ডলের শুভবিবাহের বধূবরণ অনুষ্ঠানে গত ৩০ এপ্রিল মঙ্গলনিধি প্রদান করেন সামসী মহকুমা প্রচারক দিব্যেন্দু সরকারের হাতে। অনুষ্ঠানে স্থানীয় কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবকরা উপস্থিত ছিলেন।

* * *

পুরুলিয়া জেলার জয়পুর খণ্ডের স্বয়ংসেবক চিন্ময় কুমার ও নববধূ শ্রীমতী দুলালী কুমার নিজ বিবাহ অনুষ্ঠানে সেবাকাজের জন্য মঙ্গলনিধি ও শ্রীফল অর্পণ করেন জেলা প্রচারক কাজল মণ্ডলের হাতে। অনুষ্ঠানে স্থানীয় স্বয়ংসেবক ও কার্যকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

* * *

পুরুলিয়া জেলার বিশ্বহিন্দু পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি রামবুঝাওন সিনহার সুপুত্র হেমন্ত সিনহা তাঁর সুপুত্রীর শুভ বিবাহের মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে সঙ্ঘের সেবাকাজের জন্য মঙ্গলনিধি অর্পণ করেন বিভাগ সঙ্ঘচালক অসিত কুমার দে-র হাতে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বহু কার্যকর্তা ও সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক।

শোকসংবাদ

কলকাতার রানিকুঠি এলাকার প্রবীণ স্বয়ংসেবক রামনারায়ণ গুপ্তা দীর্ঘ রোগভোগের পর গত ২২ এপ্রিল পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। তিনি স্ত্রী, ১ পুত্র, পুত্রবধূ, ১ কন্যা, জামাই ও নাতি নাতনিদের রেখে গেছেন। উল্লেখ্য, তিনি চাকরিসূত্রে ত্রিপুরায় থাকার সময় সঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত হন। সঙ্ঘের বহু দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি একজন পশুচিকিৎসক ছিলেন।

* * *

খড়্গপুরের গোপালী আশ্রমের শ্রী ওঙ্কারেশ্বর মহাদেব মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীসত্যনারায়ণ ভাগচান্দকার সুযোগ্যপুত্র তথা মন্দিরের পালক জগমোহন ভাগচান্দকা গত ২৪ এপ্রিল হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেন। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, মানবসেবা প্রতিষ্ঠান-সহ বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয় গত ২৭ এপ্রিল আশ্রমের নাটমন্দিরে।

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের তাম্রলিপ্ত জেলার নন্দীগ্রাম মহকুমা সঙ্ঘচালক অমলেন্দু পণ্ডা (মন্টুদা) গত ২ মে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। তিনি ২ পুত্র, ৩ কন্যা ও নাতি-নাতিদের রেখে গেছেন।

* * *

উত্তর মালদা জেলার কলিগ্রামের স্বয়ংসেবক অমিত দাসের মাতৃদেবী কল্পনা দাস গত ৮ মে নিজ বাসভবনে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। তিনি ৪ পুত্র, ৪ পুত্রবধূ এবং নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন। দ্বিতীয়পুত্র অমিত দাস দীর্ঘদিন কলিগ্রাম সায়ম শাখার মুখ্য শিক্ষক ছিলেন।

* * *

উত্তর মালদা জেলার কলিগ্রামের স্বয়ংসেবক মধুসূদন নন্দী গত ৬ মে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মালদার এক বেসরকারি নার্সিং হোমে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। তিনি একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন। তিনি স্ত্রী, ৩ পুত্র, ২ পুত্রবধূ ও ২ নাতনি রেখে গেছেন।

সংস্কার ভারতীর নাটক
চাণক্য-চন্দ্রগুপ্ত

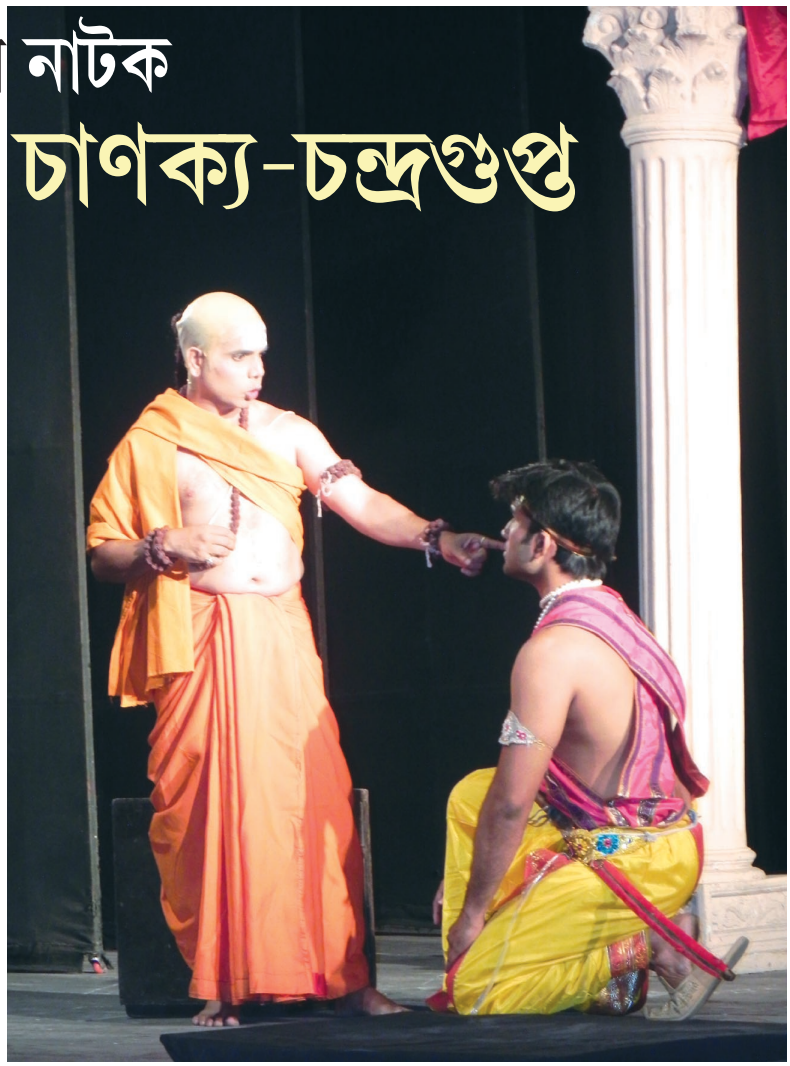

চাণক্য চন্দ্রগুপ্ত নাটকের একটি দৃশ্য। ছবি : অমিতাভ মুখোপাধ্যায়

আজ থেকে ১০৫ বছর আগে লেখা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ঐতিহাসিক নাটক 'চন্দ্রগুপ্ত' আজও সমান জনপ্রিয়। পাড়ায়, অফিস-ক্লাবে এ নাটক তো হয়ই, গ্রুপ থিয়েটারেও এ নাটক মঞ্চস্থ হচ্ছে। বছর দুয়েক আগে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মিনার্ভা রেপারটরি বেশ সাফল্যের সঙ্গে 'চন্দ্রগুপ্ত' মঞ্চস্থ করেছে। আজও সমান আগ্রহে দর্শক এ নাটক দেখছে। সম্প্রতি সংস্কার ভারতী কিছুটা সম্পাদনা করে এ নাটক 'চাণক্য-চন্দ্রগুপ্ত' নামে অভিনয় করছে। সম্পাদনা ও পরিচালনায় আছেন সুকুমার পতি। তিনি পার্বত্যরাজা চন্দ্রকেতুর বোন ছায়ার চন্দ্রগুপ্তের প্রতি একতরফা প্রেমের অংশটি বাদ দিয়েছেন। একটিমাত্র দৃশ্য ছাড়া আন্টিগোনস্-হেলেনের পর্বটুকুও বাদ দিয়েছেন। এতে নাটকটি গতি পেয়েছে। এতে মূল বিষয় অর্থাৎ মগধের রাজা নন্দের অত্যাচার, বৈমাত্রেয় ভাই চন্দ্রগুপ্তকে নির্বাসন ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিত চাণক্য ও শূদ্রানী মা মুরাকে অপমান এবং পার্বত্য সেনার সাহায্যে নন্দকে পরাজিত করে চন্দ্রগুপ্তের মগধের সিংহাসন লাভ ও পরে চাণক্যের সহায়তায় গ্রীক সম্রাট সেলুকাসকে পরাস্ত করে আসমুদ্র ভারত অধিকার— প্রাধান্য পেয়েছে।

দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর এই নাটকে চন্দ্রগুপ্তকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এটাই স্বাভাবিক। চন্দ্রগুপ্তকে কেন্দ্র করে নাটক এগিয়েছে। তবু বলতে হয়, চাণক্য নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের এক অপূর্ব সৃষ্টি। ব্রাহ্মণ, বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান চাণক্য রাজশক্তির দ্বারা নিপীড়িত। ঈশ্বর তাঁর গৃহলক্ষ্মীকে কেড়ে নিয়েছেন, দস্যু তাঁর একমাত্র কন্যা আত্রেয়ীকে অপহরণ করেছে। তাঁর অন্তরে ক্ষমা, দয়া, সমবেদনা অন্তর্হিত। পরিবর্তে ঘৃণা, প্রতিহিংসা তাঁর সত্তাকে গ্রাস করেছে। নাটকের শেষে নন্দবংশকে নির্মূল করে, চন্দ্রগুপ্তকে ভারত সম্রাট করেন তিনি। অপহৃত কন্যা অত্রেয়ীকে ফিরে পেয়ে শান্ত হন তিনি। শেষ দৃশ্যে চন্দ্রগুপ্তকে বলেন, 'আমি যা এতদিন করেছি— তা অদ্ভুত হলেও ব্রাহ্মণের কাজ নয়। ঘৃণা, প্রতিহিংসা— ব্রাহ্মণের উচিত প্রবৃত্তি নয়। ব্রাহ্মণের ধর্ম ক্ষমা, তিতিক্ষা, ত্যাগ।' এই বলে তিনি কন্যা আত্রেয়ীর হাত ধরে তাঁর পর্ণকুটিরের দিকে পা বাড়ান। নাটক 'চাণক্য-চন্দ্রগুপ্ত' এখানেই শেষ হয়।

এই নাটকে নানান দিক থেকে চাণক্য চরিত্র উদ্ভাসিত। পাশে চন্দ্রগুপ্ত যেন নিষ্প্রভ। নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল নিজের অজান্তেই যেন তাঁর 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে চাণক্যকে প্রাধান্য দিয়ে ফেলেছেন। আর আলোচ্য নাটকের চাণক্য চরিত্রের অভিনেতা সমর রায় এর সম্পূর্ণ সুযোগ নিয়েছেন। তাঁর হাঁটাচলা, স্বরক্ষেপণ চাণক্য চরিত্রটিকে মঞ্চে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। একদিকে রাজসভায় অপমানিত হয়ে ক্রোধ প্রকাশ, অন্যদিকে কন্যা আত্রেয়ীকে ফিরে পেয়ে তাঁর রোদন এককথায় প্রশংসনীয়। চন্দ্রগুপ্ত চরিত্রে সিদ্ধার্থ সাহার দেহসৌষ্ঠব রাজকীয়। অভিনয় আরও একটু রাজকীয় হওয়ার দাবি রাখে। মুরার ভূমিকায় সবিতা দে, কাত্যায়ন বেশী মদন মল্লিক, হেলেন চরিত্রে শুভরূপা চ্যাটার্জী এবং আন্টিগোনসরূপী আয়ুশ মজুমদার খুব ভালো অভিনয় করেছেন। নন্দের ভূমিকায় যোগেশ দানা ও বাচালবেশী বিভাস নস্কর দর্শকদের নজর কেড়েছেন। অজিত আচার্য, অরিজিত ভট্টাচার্য, অনির্বাণ ব্যানার্জী মঞ্চে তাদের চরিত্রকে ফুটিয়ে তুলেছেন। স্বকণ্ঠে গান গেয়েছেন গোবিন্দ বসাক। ভালো লেগেছে। একটিও সংলাপ উচ্চারণ না করে নির্বাক অভিনয়ে মুগ্ধ করেছেন সংহিতা পতি। অল্প উপকরণে মঞ্চ যথাযথ। পোশাক নিয়ে আরও ভাবতে হবে। আলো মনে দাগ কাটে না। সঙ্গীত আয়োজন পরিমিত। পরিচালককে ধন্যবাদ একটি উপভোগ্য নাটক উপহার দেওয়ার জন্য।

শব্দরূপ-৭৮৭ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

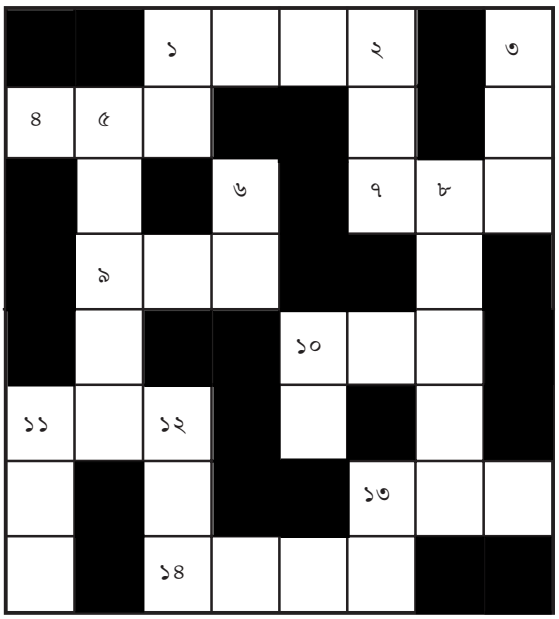

সূত্র :

পাশাপাশি : ১. বিরাট গৃহে বৃহন্নলাবেশী অর্জুনের ছদ্মনাম, **৪.** জাহাজ, নৌকা ইত্যাদি যে চালায়, **৭.** নানাপ্রকার, **৯.** যে পাঠ করে; ছাত্র, **১০.** মেঘালয়ের রাজধানী এই শৈলশহর বাঙালির পছন্দের পর্যটনকেন্দ্র, **১১.** এক প্রকার রেশমি বস্ত্র, **১৩.** 'বদনে — লড়ে, অদনে বঞ্চিত'; দাঁত, **১৪.** মহাভারতে উল্লিখিত ধৃতরাষ্ট্রের জামাতা।

উপর-নীচ : ১. নেকড়ে বাঘ, **২.** দাবিত্যাগ, **৩.** যজ্ঞকাষ্ঠ, ইন্ধন, **৫.** শ্রীকৃষ্ণের অস্থির অংশ, কথিত আছে শ্রীজগন্নাথদেবের দারুবিগ্রহের অভ্যন্তরে এই অস্থি রক্ষিত আছে, **৬.** বিহারের অন্তর্গত তীর্থস্থান, যেখানে পিণ্ড দেয়, **৮.** মতভেদ, বিরোধ, অমিল, **১০.** ত্যাগধর্মের আদর্শ প্রাচীন ভারতীয় নৃপতি, **১১.** পক্ষীরাজ; বিষ্ণুর বাহন, **১২.** দানব (কশ্যপপত্নী দনুর গর্ভজাত), **১৩.** 'পথ ভাবে আমি দেব, রথ ভাবে আমি/মূর্তি ভাবে আমি দেব, হাসে অন্তর্যামী।'

সমাধান
শব্দরূপ-৭৮৪
সঠিক উত্তরদাতা

টিঙ্কু হালদার
পূর্ব কলেজপাড়া,
রায়গঞ্জ
সুমন্ত চক্রবর্তী
বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া
সদানন্দ নন্দী
লাভপুর, বীরভূম

পু	■	■	কৃ	ত্তি	বা	স
ন্না	■	■	তা	■	গ	■
গ	জ	দ	ন্ত	■	দ	■
■	ন	■	■	উ	ত্তা	ল
■	ক	প	ট	■	■	কু
■	■	ত	■	নি	শা	চ র
■	■	ঞ্জ	■	র্যা	■	■ ট
■	কা	লি	দা	স	■	■ ন্তী

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।
খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

□ ৭৮৭ সংখ্যার সমাধান আগামী ৬ জুন ২০১৬ সংখ্যায়

প্রেরণার পাথেয়

রাষ্ট্রেরও আত্মা থাকে। তার এক শাস্ত্রসম্মত নাম আছে। সিদ্ধান্ত ও নীতি অনুসারে একে 'চিতি' বলা হয়েছে। জনসমাজ ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির হয়। 'চিতি' হলো সমাজের মূল প্রকৃতি। তা জন্মজাত হয়। ঐতিহাসিক কারণে এর উৎপত্তি হয় না। 'চিতি' মৌলিক হয়। 'চিতি' নিয়েই প্রত্যেক সমাজের উৎপত্তি হয় এবং সমাজের সংস্কৃতির অভিমুখ নির্ধারিত করে চিতি। অর্থাৎ যা চিতির অনুকূল হয় তাই সংস্কৃতিতে সম্মিলিত করে নেওয়া যায়। 'চিতি' একটি মাপদণ্ড যার দ্বারা কোনো কিছুকে গ্রহণ অথবা বর্জন করা যায়। তাই 'চিতি' রাষ্ট্রের আত্মা। এই আত্মার ওপর নির্ভর করে রাষ্ট্র দাঁড়িয়ে থাকে এবং প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির আচরণে এই আত্মার স্বরূপ প্রকাশ পায়।

'ভারত' বললে যেমন রাষ্ট্রবোধের অনুভব হয়, শুধু উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ বা অন্য কোনো প্রদেশের নাম উচ্চারণ করলে তা হয় না। এজন্য খুব ভালভাবে বুঝে নেওয়া উচিত যে কোনো নির্দিষ্ট ভূখণ্ড রাষ্ট্রের জন্য অনিবার্য হলেও কেবল ভূখণ্ডের দ্বারাই রাষ্ট্র নির্মাণ হয় না। রাষ্ট্রের স্বরূপ যার অস্তিত্বের ওপর নির্ভর করে তা দৃশ্যমান না হয়েও তার অনুভব প্রবলভাবে হয়। তাকে অস্মিতা বলা হয়। ব্যক্তির মতো রাষ্ট্রীয় জীবনেও এর গুরত্ব অপরিসীম। রাষ্ট্রীয় অস্মিতার জনই রাষ্ট্র জীবিত থাকে। তা দুর্বল হলে রাষ্ট্র পতনের দিকে এগিয়ে যায়। পৃথিবীতে অনেক রাষ্ট্র অতীত হয়ে গেছে— এর কারণ এটাই। সেই ভূখণ্ড ও জনসমাজ আজও বিদ্যমান কিন্তু রাষ্ট্র বিলুপ্ত হয়ে গেছে। রাষ্ট্রের স্বরূপ তার অস্মিতার ওপর টিকে থাকে।

(পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় ব্যক্তি-দর্শন থেকে)

With Best
Compliments
from -

A
Well Wisher

B.M.

এন সি সি-র মহিলা ক্যাডেটের হিমালয় অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ এন সি সি-র দশজন মহিলা ক্যাডেটের আপাতত একটাই লক্ষ্য—মাউন্ট এভারেস্ট! দলটি গত মাসের ২১ তারিখে বেসক্যাম্পে পৌঁছে গেছে। চলতি মাসের ১৫ থেকে ২৫ তারিখের মধ্যে যে-কোনো সময় তারা এভারেস্ট শৃঙ্গে আরোহরণ করতে পারবেন বলে আশা করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই দলে কোনো পুরুষ নেই। খুবই কঠোর প্রক্রিয়ায় এই দলের সদস্যাদের নির্বাচন করা হয়েছে। এভারেস্ট অভিযানের কথা মাথায় রেখে প্রথমে ৪০ জন মহিলা ক্যাডেট নির্বাচন করা হয়। গত বছর এপ্রিল-মে নাগাদ দলটিকে প্রশিক্ষণের জন্য পাঠানো হয় হিমাচলপ্রদেশের মাউন্ট দেওটিব্বা (১৯৬৮৮ ফুট) শৃঙ্গ অভিযানে। পারফরম্যান্সের নিরিখে দলটি থেকে ২৫ জন বাদ পড়েন। বাকি ১৫ জনকে পাঠানো হয় মাউন্ট ত্রিশূল (২৩৩৬০ ফুট) শৃঙ্গজয়ের উদ্দেশ্যে। এই দল থেকে ৫ জনকে বাদ দিয়ে এভারেস্ট অভিযানের দল গঠন করা হয়। ১৯৭০ সালে এনসিসি-র নানাবিধ কাজকর্মের মধ্যে পর্বতারোহণ অন্তর্ভুক্ত হয়। উদ্দেশ্য ক্যাডেটদের চরিত্রগঠন, পারস্পরিক সৌভ্রাতৃত্বের বিকাশ এবং মনের ভয় দূর করা।

অসমে সংস্কৃত গ্রাম

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সংস্কৃত ভাষা পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংস্কৃত ভারতী নিরলস প্রয়াস করে চলেছে। এরই অঙ্গ হিসাবে সম্প্রতি অসমের করিমগঞ্জের পাতিআলো ও আনিপুরবস্তি গ্রামদুটিকে মডেল প্রোজেক্ট হিসাবে বাছা হয়েছে যেখানে প্রাত্যহিক জীবনে সংস্কৃত ভাষায় বার্তালাপের জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। ইতিমধ্যে তারা এ কাজে কিছুটা সফল হয়েছেন। এই দুই গ্রামের দেড়শো ঘর মানুষ এখন সংস্কৃত ভাষায় কথা বলতে সক্ষম। গত এপ্রিল মাসের ২৮ তারিখে সংস্কৃত ভারতীর পনেরো দিনের শিক্ষণ শেষ হয়েছে। সংস্কৃত ভারতীর দক্ষিণ অসম প্রান্তের সম্পর্ক প্রমুখ গৌতম চক্রবর্তী জানান, আনিপুরবস্তিতে আয়োজিত মাতৃসম্মেলনে সমাজের বিভিন্ন স্তরের ৮০ জন মহিলা অংশ নেন। আবার আগামী জুন মাসেই এই দুটি গ্রামে পিতৃসম্মেলন শুরু হবে। দীপন নাথ, বাপ্পা দেবনাথ, অর্জুন নাথ ও কৌশিক নাথ এই গ্রাম দুটিকে 'সংস্কৃত গ্রাম' বানানোর লক্ষ্যে কাজ করে চলেছেন। সংস্কৃত ভারতী দীর্ঘদিন ধরেই সারা দেশে 'সংস্কৃত গ্রাম' বানানোর পরিকল্পনা নিয়েছে। ইতিমধ্যেই কর্ণাটকের মুত্তুর, হোসাহাল্লি, মধ্যপ্রদেশের ঝিরি মোহদ, ভাণ্ডুয়ার সংস্কৃত গ্রামের মর্যাদা পেয়েছে।

স্বচ্ছ ভারত অভিযানকে বান কি মুনের প্রশংসা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ভারতের 'স্বচ্ছ ভারত অভিযান' প্রয়াসে সারা পৃথিবীর মানুষের মনে একটি ইতিবাচক প্রভাব পড়ছে, তা রাষ্ট্রসঙ্ঘের মহাসচিব বান কি মুনের কথাতেই পরিষ্কার হয়েছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর এই পদক্ষেপকে উচ্চকণ্ঠে প্রশংসা করে বান কি মুন বলেন, এই প্রচেষ্টা সারা পৃথিবীর মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছে। স্বচ্ছতা অভিযানে যুক্ত কে সি মিশ্র-সহ চারজন ভারতীয় সামাজিক কার্যকর্তাকে রাষ্ট্রসঙ্ঘে স্বাগত জানিয়ে তিনি বলেন, আমি জানি দুনিয়ার বাস্তবিক সমস্যার সমাধানে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্ব ও তাঁর নতুন চিন্তাভাবনা আমাদের সবাইকে অণুপ্রাণিত করেছে।

ভারতীয় বংশোদ্ভূত সাংবাদিক সম্মানিত ওয়াশিংটনে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ বার্ষিক হোয়াইট হাউস করেসপন্ডেন্স নৈশভোজ উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ভারতীয় বংশোদ্ভূত সাংবাদিক নীলা ব্যানার্জী-সহ তার তিন সঙ্গী জন কাশম্যান জুনিয়ার, ডেভিড হাসিমার এবং লিসা সংকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে। এদিন তাদের এডগার অ্যালান পো পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়। জাতীয় এবং আঞ্চলিক

স্তরে ভালো কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ এই পুরস্কার দেওয়া হয়ে থাকে।

ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট ওয়াশিংটন ডিসি বেসড সাংবাদিক নীলা 'ইনসাইড ক্লাইমেট নিউজ'-এ যোগ দেওয়ার আগে গ্লোবাল এনার্জি, ইরাক যুদ্ধ এবং অন্যান্য বহু বিষয় নিয়ে দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস্-এ কাজ করেছেন। এমনকী 'দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল'-এর মস্কো করেসপন্ডেন্ট হিসাবেও কাজ করেছেন।

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57
16 May - 2016 - Rs. 10.00

SURYA
Energising Lifestyles

WHY SURYA LED ?

Wide beam angle for better light spread

The Next-Gen Surya LED lighting provides many advantages in terms of

- Eco Friendly
- Instant Lighting
- Low Maintenance
- High Energy Efficiency
- High Power Factor
- Lasts upto 25000 hrs
- Wide Operating Voltage Range*

WARRANTY 2 YEAR WARRANTY
ON ALL LED PRODUCTS

5W MRP ₹350/-

www.surya.co.in

*voltage range 100V - 300V

SURYA ROSHNI LIMITED
Padma Tower-1, Rajendra Place, New Delhi - 110008 (INDIA) Tel : +91-11-47108000, 25810093-96,
Fax : +91-11-25789560 E-mail : consumercare@sroshni.com
Call Toll Free No. : 1800-102-5657 Join us on facebook at www.facebook.com/suryaroshni and share your thoughts!

দাম : ১০.০০ টাকা